মানুষ ও তার :
সভ্যতার ইতিহাস



Recommended by the W. B. B. S. E. **as a** *Text Book of*
History for Class VII
Vide T. B. No. VII/H/81/36 dated 8. 1. 81.

মানুষ ও তার সভ্যতার ইতিহাস

(দ্বিতীয় ভাগ)

[সপ্তম শ্রেণীর জন্য]

শ্রীমৃণালকান্তি চক্রবর্তী, এম. এ.
অধ্যাপক, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, নব ব্যারাকপুর, ২৪ পরগনা

গ্রন্থনিলয়
৫৯/১ বি, পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীপ্রেমময় মজুমদার
৫৯/১ বি, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ : ৩০শে মে ১৯৮০
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১১ই জানুয়ারি ১৯৮১
তৃতীয় সংস্করণ : ৩০শে নভেম্বর ১৯৮১
চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৩

মূল্য : আট টাকা সত্তর পয়সা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীশ্যামলকুমার গরাই
রামকৃষ্ণ সারদা প্রেস
১২, বিনোদ সাহা লেন,
কলিকাতা-৬

বিষয়-সূচী

প্রকাশক :
শ্রীপ্রেমময় মজুমদার
৫৯/১ বি, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ : ৩০শে মে ১৯৮০
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১১ই জানুয়ারি ১৯৮১
তৃতীয় সংস্করণ : ৩০শে নভেম্বর ১৯৮১
চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৩

মূল্য : আট টাকা সত্তর পয়সা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীশ্যামলকুমার গরাই
রামকৃষ্ণ সারদা প্রেস
১২, বিনোদ সাহা লেন,
কলিকাতা-৬

বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগ

১ম পাঠ—রোমান সাম্রাজ্যের পতন—নূতন ধরনের রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা ও অর্থনীতির সূচনা ঃ

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে নবজাগরণের যুগ পর্যন্ত যে-সময় তাকে, সাধারণভাবে ইতিহাসে মধ্যযুগ বলা হয়। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যযুগের শুরু, আর প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে এই যুগের শেষ। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রাচীনকালের সভ্যতা ধীরে ধীরে নানা-ভাবে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক যুগের সভ্যতায় পরিণত হয়। তবে পশ্চিম-রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে মধ্যযুগের গভীর সম্পর্ক থাকলেও, এই সময় প্রাচীন পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলে সেইসব দেশেও প্রাচীন যুগের অবসান এবং নূতন যুগের সূচনা ঘটে। মধ্যযুগের ইতিহাসে আর-একটি বিষয়ও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন যুগের সভ্য জাতিগুলি ছাড়াও কোন কোন অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত কম উন্নত জাতির লোকেরাও মধ্যযুগের ইতিহাস ও সভ্যতা গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

সাম্রাজ্যের বিশাল আয়তন, ক্রীতদাসের সংখ্যাবৃদ্ধি, শাসন-তান্ত্রিক দুর্বলতা এবং অর্থনৈতিক সংকটের ফলে রোম সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। এই দুর্বলতার সুযোগে বিভিন্ন উপজাতি রোম আক্রমণ করতে শুরু করে। এইসব আক্রমণ-কারীর হাত থেকে সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্য সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন রোমের পরিবর্তে ইয়োরোপ ও এশিয়ার সীমানায় বাইজ্যান্টিয়াম অথবা কনস্ট্যান্টিনোপলে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। সম্রাট থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পরে রোম সাম্রাজ্য দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় রোম এবং সেখানে রাজত্ব করতে শুরু করে সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র হনোরিয়াস। পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যে অধিকার স্থাপন করে সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্র আর্কাডিয়াস। আর সেই সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় কনস্ট্যান্টিনোপল।

৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গথ ও অন্যান্য জার্মান উপজাতিদের নেতা অডোয়াসার পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট রোমুলাস

অগাস্টুলাসকে যুদ্ধে পরাজিত করে রোমের সিংহাসন অধিকার করেন। পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের উপর অডোয়াসারের অধিকার মেনে নিতে বাধ্য হন।

রোম সাম্রাজ্যের পতনের সময় রোমের সভ্যতার অগ্রগতি সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সভ্যতার ক্ষেত্রে নূতন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলে। পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের উপর জার্মান উপজাতিদের অধিকার স্থাপিত হওয়ার ফলে রোমের সভ্যতার সঙ্গে তাদের বিরোধ শুরু হয়। প্রাচীন সভ্যতা রক্ষা করার পরিবর্তে নূতন কিছু সৃষ্টি করার দিকে তারা বেশি মনোযোগ দেয়। তাহলেও রোমের শাসনব্যবস্থা, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি তাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। রোম সাম্রাজ্য জয়ের পর প্রথম দিকে তারা নিষ্ঠুরভাবে রোমের সভ্যতা ধ্বংস করলেও পরবর্তী কালে এই সভ্যতা রক্ষার জন্য তারা সচেষ্ট হয়। ধীরে ধীরে রোম ও জার্মান উপজাতিদের সভ্যতার মিলন ঘটতে থাকে। ফলে ইয়োরোপের রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নানারূপ পরিবর্তন দেখা দেয়।

২য় পাঠ—ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগ—গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ও তার পরবর্তী যুগ ঃ

হূণজাতির আক্রমণের ফলেই পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। ভারতের গুপ্ত রাজবংশের পতনেরও অন্যতম প্রধান কারণ হূণদের আক্রমণ। ৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্ত রাজবংশের শেষ শক্তিশালী রাজা স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর হূণজাতি পাঞ্জাব ও পূর্ব-মালব স্থায়িভাবে অধিকার করে। হূণদের আক্রমণে অন্যান্য অঞ্চলের গুপ্ত সাম্রাজ্যও বিপন্ন হয়ে পড়ে, এবং ধীরে ধীরে গুপ্ত সাম্রাজ্য ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এইসব রাজ্যে সাধারণভাবে গুপ্ত রাজবংশের আমলের প্রাদেশিক শাসনকর্তারা অথবা গুপ্তদের সামন্তরা নিজেদের অধিকার স্থাপন করে। গুপ্তদের রাজত্বকালে পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দেই সামন্তপ্রথা ভারতে প্রচলিত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই এই প্রথা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই যুগের ভারতের বিভিন্ন স্থানের রাজবংশগুলির মধ্যে মগধের পরবর্তী গুপ্ত রাজবংশ, উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা ও আগ্রার মৌখরী রাজবংশ, মালবের রাজা যশোধর্মণ, সৌরাষ্ট্রের বল্লভী রাজবংশ, থানেশ্বরের পুষ্যভূতি রাজবংশ, বেরারের

বাকাটক রাজবংশ এবং বঙ্গদেশের রাজা শশাঙ্কের নাম সুপরিচিত। এইসব রাজা ও রাজবংশের মধ্যে প্রায় সবগুলিই কোন-না-কোন ভাবে গুপ্ত রাজবংশের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

৩য় পাঠ—মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য ঃ

পূর্ব-রোম সাম্রাজ্য, ভারত এবং প্রাচীনকালের অন্যান্য সভ্য দেশে মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্যযুগের সূচনা আর খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ওই যুগের অবসান হয়। তবে সব দেশ সম্পর্কে একথা সত্য নয়। কোন কোন অঞ্চলে মধ্যযুগ আরও দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়। কোন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রাচীন ও আধুনিক যুগ থেকে মধ্যযুগকে আলাদা করা হয়নি। তাছাড়া মানবজাতির ইতিহাসকে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক তিনটি যুগ—প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক, এভাবে ভাগ করা সম্ভব নয়। প্রাচীন যুগের অনেক রীতি-নীতিই মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল। এমনকি আধুনিক যুগেও প্রাচীন যুগের অনেক রীতি-নীতি প্রচলিত রয়েছে। তবে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে। রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি প্রভৃতির প্রয়োজনে এই পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক। মানুষের প্রয়োজনেই প্রাচীন যুগের অনেক রীতি-নীতি মধ্যযুগে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন রূপ গ্রহণ করেনি। মানবজাতির ইতিহাস মানুষের জীবনের মতো—সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু পরিবর্তিত হলেও সব-কিছু পরিবর্তিত হয় না।

মধ্যযুগের ইতিহাসে আর-একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনকালের সভ্য দেশগুলির সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু মধ্যযুগের সভ্যতার মধ্যে এরূপ মিল খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে যেমন পার্থক্য ছিল, তাদের সভ্যতা, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শনেও তেমনি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

● মনে রাখবে

১. ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান উপজাতিদের হাতে শেষ পশ্চিম-রোম সম্রাট রোমুলাস অগাস্টুলাসের পরাজয়ের পর থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবজাগরণের

কাল পর্যন্ত সময়টাকে ইয়োরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলা হয়ে থাকে। পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটও জার্মান উপজাতিদের নেতা অডোয়াসারের প্রভুত্ব মেনে নেন।

২. রোম-সাম্রাজ্যের পতনের সময়ে রোম-সভ্যতার অগ্রগতি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

৩. বিজয়ী জার্মান উপজাতিদের সঙ্গে প্রথম দিকে রোম-সভ্যতার বিরোধ বাধে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে দুই সভ্যতার মিলন ঘটতে থাকে।

৪. ভারতবর্ষের মধ্যযুগের শুরু হয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে (৪৯৬ খ্রী.) হূণদের হাতে শেষ গুপ্ত-সম্রাট স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পরে।

৫. উভয় ক্ষেত্রেই মধ্যযুগের ব্যাপ্তি মোটামুটিভাবে ৫ম শতাব্দী থেকে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত। সবদেশে অবশ্য এই ব্যাপ্তি একরকম নয়।

৬. প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ—এ ধরনের যুগ-বিভাগ কোন নির্দিষ্ট সূত্র বা নিয়ম মেনে করা হয়নি, করা সম্ভবও নয়। প্রাচীন যুগের অনেক বৈশিষ্ট্যই মধ্যযুগকে আত্মসাৎ করে নিতে দেখা যায়।

৭. মধ্যযুগের কোন একটি নির্দিষ্ট ছাঁচ বা চেহারা আছে, এমন বলা যায় না। বিভিন্ন দেশে এর রূপ বিভিন্ন।

অনুশীলনী

১। মধ্যযুগ বলতে কি বোঝায়? মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। রোম সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি? রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ইয়োরোপে কি পরিবর্তন দেখা দেয়?

৩। ভারতের মধ্যযুগ সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

৪। এক কথায় উত্তর দাও:

(ক) পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম কি?
(খ) পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম কি?
(গ) রোম সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাটের নাম কি?
(ঘ) অডোয়াসার কাদের নেতা ছিলেন?
(ঙ) গুপ্ত রাজবংশের শেষ শক্তিশালী রাজার নাম কি?
(চ) শশাঙ্ক কোন্ দেশের শাসক ছিলেন?

৫। শূন্য স্থান পূর্ণ কর:

(ক) — আক্রমণের ফলেই পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়।
(খ) ভারতের গুপ্ত রাজবংশের পতনেরও অন্যতম কারণ — আক্রমণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইয়োরোপে মধ্যযুগ

১ম পাঠ—জার্মান উপজাতিদের উপর হূণদের আক্রমণঃ

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে মধ্য-এশিয়ার স্তেপ অঞ্চলের যাযাবর হূণজাতি দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের সমৃদ্ধ রাজ্যগুলির উপর আক্রমণ শুরু করে। ৩৭২ খ্রীষ্টাব্দে ককেশাস পর্বতের উত্তর দিকের কৃষ্ণসাগর ও নীপার নদীর মাঝামাঝি অঞ্চলে এই সময় অস্ট্রোগথ নামে একটি জার্মান উপজাতি বাস করত। ৩৭২ খ্রীষ্টাব্দে হূণজাতির একটি দল ককেশাস পর্বত পেরিয়ে এই অস্ট্রোগথদের রাজ্য আক্রমণ করে। কিছুদিনের মধ্যেই হূণজাতি আরও পশ্চিমদিকে এগিয়ে আর-একটি জার্মান উপজাতি ভিসিগথদের রাজ্যে উপস্থিত হয়। হূণদের আক্রমণে গথজাতির ছুটি শাখা, অস্ট্রোগথ বা পূর্বগথ ও ভিসিগথ বা পশ্চিমগথ উপজাতির লোকেরা দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। তারপর এই ছুটি জার্মান উপজাতিই নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য রোমান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। ৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোম সম্রাট ভ্যালেন্স ভিসিগথদের রোম সাম্রাজ্যে স্থায়িভাবে বসবাস করার অনুমতি দেন। এই অনুমতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে জার্মান উপজাতি রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। কিন্তু রোমের রাজকর্মচারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এই-সব উপজাতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আড্রিয়ানোপলের যুদ্ধে রোম সম্রাট ভ্যালেন্স গথদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। অ্যাড্রিয়ানোপলের যুদ্ধের পর জার্মান উপজাতিরা নিরুপদ্রবে বর্তমান বুলগেরিয়া অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে। অন্যান্য জার্মান উপজাতিরা স্পেন, গলদেশ প্রভৃতি স্থানে বাস করতে শুরু করে। তাদের সৈন্যবাহিনীকে রোমের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তবে বিভিন্ন জার্মান উপজাতি তাদের দলপতির নির্দেশই মেনে চলত। এইসব দলপতির মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ছিল ভিসিগথদের নেতা অ্যালারিক।

পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের উপর জার্মানদের কর্তৃত্ব স্থাপনঃ

গথদের পর ভ্যাণ্ডাল, আলেমান্নি, বার্গাণ্ডিয়ান, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি বিভিন্ন জার্মান উপজাতি রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে শুরু করে।

তাদের আক্রমণে বিব্রত হয়ে রোম-সম্রাট হনোরিয়াস ৪০২ খ্রীষ্টাব্দে রোমের পরিবর্তে র‍্যাভেনা শহরে রোম সাম্রাজ্যের নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। র‍্যাভেনায় রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর অ্যালারিক পর পর দু-বার রোম-নগরী আক্রমণ করে এবং রোমের অধিবাসীদের কাছ থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ আদায় করে।

৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে রোম-সম্রাট হনোরিয়াসের মৃত্যু হয়। হনোরিয়াসের পরবর্তী রোম-সম্রাটদের দুর্বলতার ফলে জার্মান উপজাতিরা তাদের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার সুযোগ পায়। রোম সাম্রাজ্যের রাজনীতিতেও বিদেশী উপজাতিদের কর্তৃত্ব ক্রমেই বেড়ে ওঠে। ৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হূণ-নেতা অ্যাটিলার অন্যতম সেনাপতি অরেস্টেস রোম সম্রাট জুলিয়াস নেপোসকে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করে তাঁর ছেলে রোমুলাস অগাস্টুলাসকে সিংহাসনে বসায়। কিন্তু এই রাজনৈতিক পরিবর্তনে জার্মান উপজাতিরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। নূতন সম্রাটের কাছে তারা অনেক দাবি-দাওয়া পেশ করে। রোম-সম্রাট তাদের এইসব দাবি মানতে অস্বীকার করলে জার্মান উপজাতিদের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা অডোয়াসার রোমুলাস অগাস্টুলাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অডোয়াসার রোমুলাস অগাস্টুলাসকে যুদ্ধে পরাজিত করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করে। পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট অডোয়াসারের এই আধিপত্য অতি সহজেই মেনে নিতে বাধ্য হয়। ৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অডোয়াসারকে হত্যা করে থিয়োডোরিক নামে জার্মান উপজাতির আর-একজন নেতা পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করে। শাসক হিসেবে থিয়োডোরিক ছিল বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। তার আমলে পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের সর্বত্র জার্মানদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

রোমের আইন ও রোমের সম্রাটের গুরুত্ব ঃ

জার্মান উপজাতিরা পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্য অধিকার করার পর দেশের শাসন-পদ্ধতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন করে। তবে রোমের আইন-কানুন জার্মানদের আইনকানুনের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। সেজন্য রোমের প্রচলিত নিয়ম-কানুনের তারা বিশেষ কোন পরিবর্তন করেনি। কিন্তু জার্মান উপজাতিদের কাছে ধর্মের সঙ্গে নিয়ম-বিধির

গভীর সম্পর্ক ছিল। সুতরাং প্রয়োজন অনুসারে তারা ধর্মের জন্য আইনের কোন কোন ধারার কিছু কিছু রদ-বদল করতে বাধ্য হয়।

নানা জাতি ও অনেক দেশ নিয়ে রোমান সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। সামাজিক রীতি-নীতি, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে এইসব দেশ ও জাতির মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। কিন্তু রোমের সম্রাট ছিলেন এইসব বিভেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠার প্রধান উৎস। তাঁকে কেন্দ্র করেই সাম্রাজ্যের ঐক্যের বন্ধনটি দৃঢ় হয়ে উঠত। রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীরাও সম্রাটের এই গুরুত্ব বুঝতে পারে। তারাও রোমের অনুকরণে সম্রাটের ক্ষমতা বাড়িয়ে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উপজাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করে।

২য় পাঠ—অ্যালারিক, অ্যাটিলা ও গ্যাসেরিক :

অ্যালারিক—অ্যালারিক ভিসিগথ উপজাতির নেতা ছিল। রোম সম্রাট থিওডোসিয়াসের আমলে অ্যালারিক রোমের সেনা-বাহিনীতে যোগ দেয়। ফ্রাঙ্ক উপজাতির নেতা আরবোগাস্ট এই সময় বেশ কয়েকবার রোম আক্রমণ করে। অ্যালারিক প্রতিটি যুদ্ধে খুব বীরত্বের পরিচয় দেয় এবং আরবোগাস্টকে পরাজিত করে। সম্রাট থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পর সম্রাট হনোরিয়াস রোমের সিংহাসনে বসেন। তাঁর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে অ্যালারিক সম্রাটের একজন প্রধান শত্রু হয়ে ওঠে। এই সময় পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গেও তার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। ফলে অ্যালারিক ভিসিগথ উপজাতির জন্য নূতন বাসস্থানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। অ্যালারিকের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ভ্যাণ্ডাল দলপতি স্টিলিচো। আততায়ীর হাতে স্টিলিচোর মৃত্যু হলে অ্যালারিক কয়েকবার রোম আক্রমণ করে এবং রোমের অধিবাসীদের কাছ থেকে প্রচুর ধনরত্ন আদায় করে। কিন্তু ভিসিগথরা রোমে বাসস্থান যোগাড় করতে ব্যর্থ হল। তখন অ্যালারিক উত্তর আফ্রিকায় তার সঙ্গীদের জন্য বাসস্থান খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু ৪১১ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ অ্যালারিকের মৃত্যু হয় এবং ভিসিগথদের জন্য কোন স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা তার পক্ষে আর সম্ভব হল না।

অ্যাটিলা—হূণদের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিল অ্যাটিলা। অ্যাটিলার নেতৃত্বে ৪৪৫ থেকে ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হূণ শক্তি বারবার পূর্ব-রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। হূণদের আক্রমণে ভীত হয়ে পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট তাদের কর দিতেও বাধ্য হন। তারপর পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের উপর হূণরা আক্রমণ শুরু করে। বিশাল একদল সৈন্য নিয়ে অ্যাটিলা রাইন নদী পার হয়ে গল-দেশে (বর্তমান ফ্রান্সে) পৌঁছয়। গথ, ফ্রাঙ্ক, বার্গাণ্ডিয়ান ও রোমের অধিবাসীরা একযোগে হূণদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে স্যালোনে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয় এবং হূণরা পরাজিত হয়। যুদ্ধে পরাজয়ের পর অ্যাটিলা দক্ষিণ দিকে পালিয়ে আসে এবং ইটালি আক্রমণ করে। ইটালির সৈন্যবাহিনীর পক্ষে অ্যাটিলাকে প্রতিরোধ করা অথবা তার আক্রমণের হাত থেকে রোম নগরী রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু রোমের বিশপ লিও-র বিচক্ষণতায় রোম নগরী হূণদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। লিও অ্যাটিলার দুর্গে প্রবেশ করে তাকে রোম আক্রমণ করতে নিষেধ করেন। তিনি অ্যাটিলাকে একথাও জানান যে সে রোম আক্রমণ করলে ঈশ্বর এর প্রতিশোধ নেবেন। লিও-র অনুরোধের জন্যই হোক অথবা ঈশ্বরের ভয়েই হোক, অ্যাটিলা রোম আক্রমণ না করে নিজের রাজ্যে ফিরে যায়। ৪৫২ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাটিলার মৃত্যু হয়।

গ্যাসেরিক—গ্যাসেরিক ছিল ভ্যাণ্ডাল উপজাতির নেতা। স্পেনে ভ্যাণ্ডালদের একটি উপনিবেশ ছিল। কিন্তু ভিসিগথদের কাছে পরাজিত হয়ে ভ্যাণ্ডালরা স্পেন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তারপর ৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভ্যাণ্ডালরা গ্যাসেরিকের নেতৃত্বে উত্তর আফ্রিকায় আশ্রয় নেয়। দীর্ঘ দশ বছর যুদ্ধ করে ভ্যাণ্ডালরা রোমের সৈন্যদের পরাজিত করে এবং কার্থেজ শহরটি জয় করে নেয়। গ্যাসেরিক ও তাঁর দলবল তখন ভূমধ্যসাগরে জলদস্যুতা শুরু করে। ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভ্যাণ্ডালরা রোম আক্রমণ করে। রোমের সম্রাট ভ্যালেন্টিনিয়ান ভ্যাণ্ডালদের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। রোমের বিশপ লিও গ্যাসেরিককে রোম আক্রমণ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু গ্যাসেরিক তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেননি। রোম জয়ের পরে ভ্যাণ্ডালরা রোমের অধিবাসীদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালায় এবং

প্রচুর ধন-সম্পদ লুটপাট করে। গ্যাসেরিকের নেতৃত্বেই পশ্চিম-সিসিলিতে ভ্যাণ্ডালদের রাজ্য স্থাপিত হয়।

৩য় পাঠ—জার্মান উপজাতিদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন :

গথ, ভ্যাণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক, লোম্বার্ডস, বার্গাণ্ডিয়ান প্রভৃতি জার্মান উপজাতিরা দক্ষিণ-ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থানে বসতি গড়ে তোলার আগে প্রায় যাযাবরের জীবন যাপন করত। খাদ্য-সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন স্থানে তারা ঘুরে বেড়াত। চাষ-বাসের কাজেও তারা কোন রকম উন্নতি করতে পারেনি। পশু-পালন, পশু-শিকার ও মাছ ধরাই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। পুরুষরা শিকার ও যুদ্ধ করত এবং মেয়েরা সংসারের দায়িত্ব পালন করত। দক্ষিণ ইয়োরোপের ইটালি অথবা গ্রীস দেশের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ না থাকার ফলে তাদের সমাজ-জাবনে কোন পরিবর্তন হয়নি। বাইরের জগতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গেও তাদের কোন পরিচয় ঘটেনি। তবে ন্যায় ও নীতির উপর তাদের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। পরিবারের পবিত্রতা খুব সর্তকভাবে তারা মেনে চলত।

রক্তের সম্বন্ধ অর্থাৎ নিজেদের পরিবারের মধ্যেই জার্মান উপজাতিদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠত। রাষ্ট্র সম্পর্কে তাদের কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। সাধারণত তারা কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার পরিবর্তে বিশেষ কোন বীর ও সাহসী নেতার অনুগত থাকাই বেশি পছন্দ করত। যে-কোন উপজাতির লোকেরাই তাদের নেতার নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য হত। এরা সবাই যুদ্ধবিদ্যায় খুব দক্ষ ছিল। যুদ্ধবিদ্যায় রোমের সৈন্যরা তাদের সমকক্ষ ছিল না।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এইসব উপজাতির রাজনৈতিক জীবনে কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। নিজেদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনেই কয়েকটি উপজাতি মিলে একটি সংঘ গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলেই প্রায় ছ-টি সংঘ গড়ে ওঠে।

জার্মান উপজাতির ধর্মজীবন খুব সহজ ও সরল ছিল। তারা সাধারণত বন-জঙ্গল, বিল, হ্রদ, কুয়াশা, বিদ্যুৎ প্রভৃতির পুজো করত। তবে দক্ষিণ-ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবেশের পূর্বেই তাদের

অনেকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। উলফিলাস নামে একজন খ্রীষ্টান পুরোহিত উপজাতিদের ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। তাঁর চেষ্টায়ই জার্মান উপজাতিদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

রোম সাম্রাজ্যে জার্মান উপজাতিদের বসতি স্থাপন ঃ

হূণদের আক্রমণে ভীত হয়ে জার্মান উপজাতিদের মধ্যে অস্ট্রোগথরাই প্রথমে রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে শুরু করে। ৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাড্রিয়ানোপলের যুদ্ধে রোমের সৈন্যবাহিনীর পরাজয়ের ফলে গথদের সাহস খুব বেড়ে যায়। অস্ট্রোগথ নেতা অ্যাসারিকের নেতৃত্বে তারা গ্রীস ও ইটালি পেরিয়ে স্পেনে পৌঁছয়। ফলে তারা রোম নগরী আক্রমণ ও লুটতরাজ করার সুযোগ পায়। শেষ পর্যন্ত স্পেনে অস্ট্রোগথরা স্থায়িভাবে বসবাস করতে শুরু করে।



অস্ট্রোগথদের পরে রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে ভিসিগথরা। ভিসিগথদের নেতা থিওডোরিকের নেতৃত্বে তারা মধ্য-ইটালিতে বসতি স্থাপন করে। তারপর রোম সাম্রাজ্যে এসে উপস্থিত হয় ভ্যাণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক, লোম্বার্ডস ও বার্গাণ্ডিয়ানরা। ভ্যাণ্ডালরা উত্তর-আফ্রিকার কার্থেজ অধিকার করে। ভ্যাণ্ডাল-নেতা গ্যাসেরিকের নেতৃত্বে তারা রোম আক্রমণ করে এবং নির্দয়ভাবে সেখানে লুটপাট চালায়। রোম উপত্যকায় বার্গাণ্ডিয়ানদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে।

লোম্বার্ডসদের বসতি গড়ে ওঠে পো নদীর তীরবর্তী উর্বর অঞ্চলে। অ্যাঙ্গলস্, জুটস ও স্যাক্সন জাতি ব্রিটেন অধিকার করে। সুয়েভিন উপজাতি উত্তর-পশ্চিম স্পেন ও আলেমাঙ্গিরা সুইজারল্যাণ্ড অধিকার করে। লোভিসের নেতৃত্বে ফ্রাঙ্করা গলদেশ (বর্তমান ফ্রান্স) দখল করে। পরবর্তী কালে জার্মান উপজাতিদের মধ্যে ফ্রাঙ্করাই সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জার্মান উপজাতিরা পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই নিজেদের অধিকার স্থাপন করে। রোম সাম্রাজ্যের গৌরবের দিন শেষ হয়ে গেল। যে জার্মান উপজাতিদের রোমের অধিবাসীরা বর্বর বলে মনে মনে ঘৃণা করত তারাই রোম সাম্রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী হয়ে উঠল।

রোমের অধিবাসীদের সঙ্গে জার্মান উপজাতিদের মিলন—জার্মান উপজাতিদের উপর খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব ঃ

রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করার ফলে ক্রমে এইসব জার্মান উপজাতির সঙ্গে রোমের জনসাধারণের সামাজিক সংযোগ ও বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এইসব উপজাতি রোমের আইন-কানুন, ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে ধীরে ধীরে নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের দুটি সভ্যতা ও জাতির মিলনের ফলে এই যুগে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টানদের গির্জাগুলি রোম সাম্রাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাদের প্রভাবে জার্মান উপজাতিদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা অনেক পরিমাণে কমে যায়। সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী জার্মান উপজাতিরা রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করলেও, রোমের সভ্যতা ও রোমের ধর্ম কিন্তু তাদের সম্পূর্ণভাবে জয় করে নেয়। এই দুই ভিন্ন সভ্যতার মিলনের ফলে ইয়োরোপে একটি নূতন যুগের সূচনা হয়।

● মনে রাখবে

১. ৪র্থ শতাব্দীর শেষভাগে মধ্য-এশিয়ার স্তেপ-অঞ্চলের যাযাবর হূণ জাতি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এরা জার্মান উপজাতির প্রধান দুটি শাখা—অস্ট্রোগথ ও ভিসিগথদের পরাজিত করে।

২. পরাজিত জার্মান উপজাতির লোকেরা শেষ পর্যন্ত রোম-সাম্রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোম-সম্রাট ভ্যালেন্স ভিসিগথ-শাখার উপজাতিদের রোম-সাম্রাজ্যে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি দেন। এরপর দলে দলে জার্মান উপজাতির লোকেরা রোম-সাম্রাজ্যের নানা জায়গায় বসতি গড়ে তোলে।

৩. রোমের রাজকর্মচারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একসময়ে এই উপজাতিরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাড্রিয়ানোপলের যুদ্ধে রোম-সম্রাট ভ্যালেন্স গথদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। ভিসিগথদের নেতা অ্যালারিক দক্ষিণ রোম-সাম্রাজ্যের জার্মানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পরপর দু-বার রোম-নগরী আক্রমণ করে প্রচুর ধনসম্পদ আদায় করে নেন। অন্যান্য জার্মান উপজাতিরাও উপদ্রব শুরু করায় রোম-সম্রাট হনোরিয়াস রোম থেকে র‍্যাভেনায় রাজধানী সরিয়ে আনতে বাধ্য হন।

৪. সম্রাট হনোরিয়াসের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে জার্মান উপজাতিরা নিজেদের ক্ষমতা বাড়াবার চেষ্টা করে। হূণ-নেতা অ্যাটিলাও এসময়ে ক্ষমতা বিস্তারের লোভে রোমের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি সম্রাট জুলিয়াস নেপোসকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে তাঁর ছেলে রোমুলাস অগাস্টুলাসকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু উপজাতিদের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা অডোয়াসারের হাতে রোমুলাস পরাজিত হন। অডোয়াসারের পর উপজাতিদের আর-একজন নেতা থিয়োডোরিক পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। তিনি খুব বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। এছাড়া, ভ্যাণ্ডাল-উপজাতির নেতা গ্যাসেরিকও রোম-সাম্রাজ্যে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নেতৃত্বে পশ্চিম-সিসিলিতে ভ্যাণ্ডালদের রাজ্য স্থাপিত হয়।

৫. বিভিন্ন জার্মান উপজাতির লোকেরা যাযাবরের জীবন কাটাত। পশুশিকার, পশুপালন ও মৎস্যশিকার ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। তাদের ধর্মজীবন ছিল সহজ, সরল। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে তারা দেবতা ভেবে পুজো করত। বাইরের জগতের সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের কোন পরিচয় ছিল না।

৬. প্রথম দিকে কিছু কিছু বিরোধ ঘটলেও ক্রমে রোমানদের সঙ্গে এইসব উপজাতি-শ্রেণী লোকদের সামাজিক সংযোগ ও বৈবাহিক সম্পর্কাদি গড়ে উঠতে থাকে এবং রোমান সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব এদের উপর পড়তে থাকে। দুয়ের মিলনে ইয়োরোপে একটি নূতন যুগের সূচনা হয়।

অনুশীলনী

১। জার্মান উপজাতিরা কেন রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে শুরু করে? জার্মান উপজাতিরা রোম সাম্রাজ্যের কোন্ কোন্ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে?

২। পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের উপর জার্মান উপজাতিরা কিভাবে অধিকার স্থাপন করে?

৩। রোমের আইন ও রোম সম্রাটের গুরুত্ব সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৪। অ্যালারিক সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

৫। অ্যাটিলা সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

৬। গ্যাসেরিক সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

৭। জার্মান উপজাতিদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন কিরূপ ছিল?

৮। জার্মান উপজাতিদের সঙ্গে রোমের অধিবাসীদের যোগাযোগের ফলে ইয়োরোপের ইতিহাসে কি কি পরিবর্তন দেখা দেয়?

৯। সংক্ষেপে উত্তর দাও:
- (ক) র‍্যাভেনায় কেন রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হয়?
- (খ) খ্রীষ্টধর্ম কিভাবে জার্মান উপজাতিদের জীবনে পরিবর্তন আনে?
- (গ) উলফিলাস কে ছিলেন? তাঁর সম্পর্কে কি জান?

১০। এক কথায় উত্তর দাও:
- (ক) কোন্ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাড্রিয়ানোপলের যুদ্ধ হয়?
- (খ) অ্যালারিক কাদের নেতা ছিলেন?
- (গ) কার নেতৃত্বে ফ্রাঙ্করা গলদেশ অধিকার করে?
- (ঘ) অস্ট্রোগথরা কোথায় স্থায়িভাবে বাস করতে শুরু করে?
- (ঙ) বার্গাণ্ডিয়ানরা কোথায় বসতি স্থাপন করে?

১১। সঠিক উত্তরের পাশে এই চিহ্নটি √ বসাও:
- (ক) জার্মান উপজাতিদের ধর্মজীবন খুব সরল / জটিল ছিল।
- (খ) রাষ্ট্র সম্পর্কে জার্মান উপজাতিদের কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল / ছিল না।
- (গ) অস্ট্রোগথদের পর রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে ভিসিগথরা / ভ্যাণ্ডালরা।
- (ঘ) ৪৫০ / ৪৫২ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাটিলার মৃত্যু হয়।
- (ঙ) ৪৫৫ / ৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভ্যাণ্ডালরা রোম আক্রমণ করে।

তৃতীয় অধ্যায়

ইয়োরোপের অন্ধকার যুগের কথা

১ম পাঠ—ইয়োরোপের ইতিহাসে চতুর্থ থেকে সপ্তম শতক ঃ সাধারণত ইউরোপের ইতিহাসের মধ্যযুগকে 'অন্ধকার যুগ' বলা হয়। কিন্তু এই যুগকে পিছিয়ে-পড়া বা অনুন্নত অথবা অনগ্রসর, এ-রকম অর্থে অন্ধকার যুগ বলার কোন বিশেষ কারণ বা যুক্তি নেই। তবে এই সময়ের ইতিহাসের অনেক কাহিনী বা ঘটনা ঠিকমতো জানা যায় না বলে এ যুগকে হয়ত অন্ধকার যুগ বলা যেতে পারে। প্রকৃত-পক্ষে, নব জাগরণের যুগের পণ্ডিতেরাই মধ্যযুগকে প্রথম অন্ধকার যুগ বলে বর্ণনা করেন। কারণ মধ্যযুগে প্রাচীনকালের কাব্য-সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতির যথেষ্ট অবহেলা করা হত। এই যুগের লোকেরা প্রাচীন যুগের সভ্যতার কোন গুরুত্বও বুঝতে পারেনি। নব জাগরণের যুগে প্রাচীন যুগের সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি আবার তার উপযুক্ত সম্মান ফিরে পায়। এই দুই যুগের মানুষের চিন্তাধারার ও জ্ঞানের পার্থক্য বোঝাবার জন্যই 'অন্ধকার যুগ' কথাটি বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। একথা ঠিক যে জার্মানির উপজাতিরা প্রথম যখন পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে শুরু করে, গ্রীস বা রোমের সভ্যতা সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না। রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের উপর নিজেদের অধিকার স্থাপন করতেই তারা ব্যস্ত ছিল। তাদের পক্ষে গ্রীস বা রোমের সভ্যতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়নি। বিশেষত জার্মানির উপজাতিদের বার বার আক্রমণের ফলে রোমের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতি কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে জার্মানির উপজাতিরাই পশ্চিম ইয়োরোপের পুরনো সভ্যতার ভিত্তির উপর আর-একটি নূতন এবং আরও উন্নত সভ্যতা গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করে। তাছাড়া পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের উপর জার্মানির উপজাতিরা কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এই যুগে আরব অঞ্চলেও একটি নূতন সভ্যতা গড়ে ওঠে। যে যুগে বাইজ্যান্টাইন সভ্যতা অথবা আরব সভ্যতার মতো উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে, সে যুগকে কোনভাবেই অন্ধকার যুগ বলা উচিত নয়।

২য় পাঠ—শিক্ষার ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের মঠগুলির দান :

পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু খ্রীষ্টানদের গির্জা ও খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের মঠগুলো ধীরে ধীরে আবার নূতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে। সাধারণত গির্জার সঙ্গেই সন্ন্যাসীদের বাস করার জন্য মঠ তৈরি হত। ওই মঠগুলোই ক্রমে হয়ে ওঠে শিক্ষার কেন্দ্র। মঠের সন্ন্যাসীরা কৃষি, বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সাধারণ শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে চেষ্টা করতেন। সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেক দক্ষ শ্রমিক ও উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন। অনেক মঠের অধীনেই আদর্শ কৃষিক্ষেত্র থাকত। সন্ন্যাসীরা জলাভূমির জল নিকাশ করে ও পতিত জমি পরিষ্কার করে নূতন নূতন কৃষির জমি তৈরি করতেন। জমিতে নূতন নূতন ফসল ফলাতেন। পশুপালনের ক্ষেত্রেও তাঁরা অনেক উন্নতি করেন। তাঁদের এসব কাজের ফলে সাধারণ লোক খুব উপকৃত হত। তবে ধর্ম ও নৈতিক জীবন সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারেই তাঁদের ঝোঁক ছিল বেশি। পুরনো পুঁথিপত্র সংগ্রহ ও রক্ষা করা এবং নূতন গ্রন্থ রচনা করার দিকেও তাঁদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। আদর্শ সমাজ গঠনের জন্যও তাঁরা বিশেষভাবে চেষ্টা করতেন। সে-যুগের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই এইসব মঠে আশ্রয় পেতেন এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে অংশ নিতেন। কারণ মধ্যযুগে এই সমস্ত মঠই ছিল একমাত্র শিক্ষার কেন্দ্র। প্রায় আট-শ বছর ধরে ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করে। এইসব মঠের সন্ন্যাসী ও শিক্ষকরা বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানতার হাত থেকে ইয়োরোপের জনসাধারণকে উদ্ধার করেন, তাদের প্রকৃত জ্ঞানের আলোর সন্ধান দেন। শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে সন্ন্যাসী বেনিডিক্টের আদর্শে গড়ে-ওঠা মঠগুলোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। পরবর্তীকালে এইসব মঠের অনেক স্কুলকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সাহিত্য পঠন-পাঠনে এইসব মঠ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় পাঠ্য-পুস্তকের অভাবের জন্য তাঁরা

এইসব পড়াতে এবং যত্নের সঙ্গে এই বইগুলো রক্ষা করতে বাধ্য হন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এইভাবে তাঁরা এইসব গ্রন্থ রক্ষা করার সুব্যবস্থা করেছিলেন বলেই শুধু মধ্যযুগের নয়, সমস্ত যুগের মানবজাতির এক বিরাট উপকার হয়েছে।

৩য় পাঠ—ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে খ্রীষ্টান পুরোহিত বা যাজকদের ধারণা—সভ্যতার উপর তার প্রভাব ঃ

রোম-সাম্রাজ্যের পতনের পর ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে অরাজকতা ও রাজনৈতিক অশান্তি দেখা দেয়। অরাজকতা ও রাজনৈতিক অশান্তির এই যুগে খ্রীষ্টানদের ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার জন্য চেষ্টা শুরু করে। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে খ্রীষ্টান যাজকরাও তাঁদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার বিশেষ সুযোগ পান। দেশের জনসাধারণও ধীরে ধীরে সমস্ত কিছুর জন্যই তাঁদের উপর নির্ভর করতে শুরু করে এবং যাজকের কথাকে তারা অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে থাকে। সংসারের সুখে লিপ্ত থাকা, প্রতিবেশীর সম্পত্তির প্রতি লোভ করা, পরের জিনিস-পত্র অপহরণ করা প্রভৃতি বিষয়কে যাজকরা অন্যায় বলে মনে করতেন। আর সকলের প্রতি নিজের ভাইয়ের মতো ব্যবহার করা, সৎভাবে জীবন যাপন করা এবং এই জগতের অল্পদিনের জীবনকে সৎকাজে ব্যয় করে স্বর্গলোকের দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়াকে ন্যায় বলে মনে করতেন। গির্জা এবং যাজকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও গরিবদের যথাসাধ্য সাহায্য, ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতা রক্ষা এবং চুক্তি অনুসারে কাজ করা খ্রীষ্টানদের কর্তব্য বলে মনে করা হত।

সম্রাট ও রাজকর্মচারীদের ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে যাজকদের ক্ষমতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। সমাজজীবনেও তাঁদের গুরুত্ব অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। তাছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প প্রভৃতি বিষয়েও তাঁরা যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। ফলে অতিসহজেই মানুষের মনের উপর তাঁরা গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। রাজনৈতিক অশান্তির যুগে গির্জাগুলিও ছিল শিক্ষা এবং সভ্যতার নিদর্শন রক্ষা করার নিরাপদ আশ্রয়। সেজন্যে মধ্যযুগের সভ্যতার

উপর যাজকদের চিন্তাধারা ও বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

● মনে রাখবে

১. ইয়োরোপের ইতিহাসে ৪র্থ থেকে ৭ম শতক 'অন্ধকার যুগ' নামে পরিচিত।

২. কিন্তু 'অন্ধকার যুগ' বলতে এক্ষেত্রে শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা বা পিছিয়ে থাকা বোঝায় না। তবে এ-যুগের অনেক ঘটনাই অন্ধকারে ঢাকা, যথার্থ ইতিহাস জানা যায় না—এই দিক থেকে 'অন্ধকার যুগ' বলা যেতে পারে।

৩. নবজাগরণ-যুগের পণ্ডিতেরাই এরূপ নামকরণ করেছেন। মধ্যযুগের সঙ্গে তুলনায় জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রেই তাঁরা যে অনেক উন্নত ছিলেন, একথাটাই তাঁরা এভাবে বোঝাতে চেয়েছিলেন।

৪. মধ্যযুগেও বিদ্যাচর্চা থেমে যায়নি। পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের পতনের ফলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস হয়ে যায় বটে, কিন্তু গির্জা এবং খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের মঠগুলি ধীরে ধীরে এর জায়গা অধিকার করে। মঠের সন্ন্যাসীরা কৃষি, বিজ্ঞান, চিকিৎসা-শাস্ত্র, শিল্প, সাহিত্য, সাধারণ শিক্ষা, নীতিশিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে জনসাধারণকে শিক্ষা দিতেন। পুরনো পুঁথি সংরক্ষণের ব্যবস্থাও এসব মঠে ছিল।

৫. সমাজজীবনে যাজকদের প্রভাব বেড়ে যায়। মধ্যযুগের সভ্যতার ইতিহাসে যাজকদের ভূমিকাটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলনী

১। ইয়োরোপের মধ্যযুগকে কি অন্ধকার যুগ বলা চলে?

২। শিক্ষার ক্ষেত্রে সন্ন্যাসীদের মঠগুলোর দান সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

৩। ন্যায় ও অন্যায় সম্বন্ধে যাজকদের কিরূপ ধারণা ছিল? তাঁদের এই ধারণা সভ্যতার উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে?

৪। সংক্ষেপে উত্তর দাও:

(ক) মঠের সন্ন্যাসীরা কিভাবে দেশের সাধারণ লোক ও কৃষকদের সাহায্য করত?

(খ) মধ্যযুগে যাজকদের ক্ষমতা কেন বৃদ্ধি পায়?

৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:

(ক) মধ্যযুগে সন্ন্যাসীদের মঠগুলোই হয়ে ওঠে — —।

(খ) সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেক দক্ষ — ও উঁচুস্তরের — ছিলেন।

(গ) সাধারণত ইয়োরোপের ইতিহাসের মধ্যযুগকে — বলা হয়।

(ঘ) মধ্যযুগের সভ্যতার উপর যাজকদের — ও — যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ লাভ করে।

চতুর্থ অধ্যায়

বাইজ্যান্টাইন সভ্যতা

১ম পাঠ—সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইনের আমলে কনস্ট্যাণ্টিনোপল বা কনস্ট্যাণ্টাইন নগরীর পত্তন—খ্রীষ্টধর্ম পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সরকারী ধর্মরূপে স্বীকৃত ঃ

৩০৬ থেকে ৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কনস্ট্যাণ্টাইন রোম-সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন। এই সময় জার্মানির উপজাতিরা বারবার রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম নগরী আক্রমণের চেষ্টা করে। বিশাল রোম সাম্রাজ্য ভালোভাবে শাসন করা এবং বাইরের শত্রুর হাত থেকে রাজধানী নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইন একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করতে উদ্যোগী হন। তিনি ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে পুরনো দিনের গ্রীক উপনিবেশ বাইজ্যান্টিয়ামে রোম সাম্রাজ্যের নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। নূতন রাজধানীর স্থান নির্বাচনে কনস্ট্যাণ্টাইন বিশেষ বুদ্ধি ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। ইয়োরোপ ও এশিয়ার সংযোগস্থলে বস্‌ফোরাস প্রণালীর কাছে বাইজ্যান্টিয়াম অবস্থিত। সম্রাটের নাম অনুসারে বাইজ্যান্টিয়ামের নূতন নাম হয় কনস্ট্যান্টি-নোপল বা কনস্ট্যাণ্টাইনের শহর। অল্পদিনের মধ্যেই রোম সাম্রাজ্যের এই নূতন রাজধানী রোমের শিল্প, সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

প্রথম জীবনে সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইন খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধী ছিলেন। খ্রীষ্টানদের উপর তিনি নানা ধরনের অত্যাচারও করেন। কিন্তু ৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে মিলান শহর থেকে প্রচারিত এক নির্দেশে তিনি খ্রীষ্টধর্ম রোম সাম্রাজ্যের ধর্ম বলে ঘোষণা করেন। খ্রীষ্টানদের উপর সদয় ব্যবহার করার জন্যও তিনি রাজ্যের সমস্ত প্রজাদের নির্দেশ

দেন। সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইন নিজে কিন্তু তখনও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেননি। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের ঐক্য ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই তিনি খ্রীষ্টধর্মকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন। তবে তখনও রোম সাম্রাজ্যে পুরনো ধর্মমতও যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল।

২য় পাঠ—সম্রাট জাস্টিনিয়ান—রোম সাম্রাজ্যের ঐক্য পুনরায় স্থাপনের জন্য চেষ্টা :



পূর্ব ও পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য

৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পর রোম সাম্রাজ্য দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় রোম এবং পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় কনস্ট্যান্টিনোপল। জার্মানির বিভিন্ন উপজাতির আক্রমণে পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্য ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। আর অন্যদিকে সামরিক শক্তির সাহায্যে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যায়। সাম্রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটেরা যথেষ্ট পরিশ্রম করতেন।

৫২৭ থেকে ৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কনস্ট্যান্টিনোপলের সিংহাসনে ছিলেন সম্রাট জাস্টিনিয়ান। জাস্টিনিয়ানের শাসনকাল থেকেই পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের গৌরবের যুগের আরম্ভ হয়। অনেকদিন ধরে রোম সাম্রাজ্য দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেলেও পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের শাসকরা কোনদিনই রোম সাম্রাজ্যের ও তার রাজধানী রোম নগরীর আগেকার গৌরব ভুলতে পারেননি। কোষাগারে সঞ্চিত অর্থ এবং শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে সম্রাট জাস্টিনিয়ান জার্মান উপজাতিদের অধিকৃত পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্য জয় করে দু-ভাগে বিভক্ত রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে আবার রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকেন। উত্তর-আফ্রিকা, স্পেন ও ইটালির রোমান অধিবাসীরাও সম্রাটকে এই ব্যাপারে উৎসাহ দেয়।

৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাস্টিনিয়ান এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে উত্তর-আফ্রিকায় উপস্থিত হন। পরপর দুটি যুদ্ধেই ভ্যাণ্ডালরা তাঁর কাছে পরাজিত হয়। কিছুদিনের জন্য উত্তর-আফ্রিকায় কনস্ট্যান্টিনোপলের কর্তৃত্ব স্থাপিত হল। কিন্তু ভ্যাণ্ডালদের শক্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস না করেই জাস্টিনিয়ানের সেনাপতি বেলিসারিয়াস ইটালির অস্ট্রোগথদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। ইটালিতে কনস্ট্যান্টিনোপলের অধিকার স্থাপিত হয়। র‍্যাভেনায় আবার ইটালির রাজধানী স্থাপিত হয় এবং জাস্টিনিয়ানের নির্দেশে একজন শাসক ইটালির শাসন পরিচালনা করতেন।


জাস্টিনিয়ান

উত্তর-আফ্রিকা ও ইটালি থেকে জার্মান উপজাতিদের বিতাড়িত করলেও জাস্টিনিয়ান স্পেন থেকে ভিসিগথদের তাড়াবার বিশেষ কোন চেষ্টা করেননি। গলদেশের ফ্রাঙ্কদেরও দমন করার জন্য তিনি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এমনকি পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের সীমানা নির্দিষ্টভাবে স্থির করা এবং সেই সীমানা সুরক্ষিত করে তোলা যে একান্ত প্রয়োজন, একথা তিনি কখনও ভালোভাবে বুঝতে পারেননি। ফলে পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সৈন্যরা চলে আসার পরই লোম্বার্ডসরা ইটালি অধিকার করে। কিছুদিন পরেই মুসলমান শক্তি

উত্তর-আফ্রিকায় নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করে। সম্রাট জাস্টিনিয়ান দুই রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা এইভাবে নষ্ট হয়ে গেল। তাঁর নীতির ফলে পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্য আরও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ইটালির দুর্দশা আরও বেড়ে যায়।

৩য় পাঠ—সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আইন সংকলন ঃ

আইন সংকলনের গুরুত্ব—জাস্টিনিয়ানের পূর্বে রোম সাম্রাজ্যে কোন-রূপ লিখিত আইন ছিল না। প্রচলিত আইনকে বিভিন্ন শ্রেণীতেও ভাগ করা হয়নি। বিচারকরা অনেক সময় নিজেদের ইচ্ছামতো আইনের ব্যাখ্যা করত। তার ফলে অনেক রকম অসুবিধা দেখা দিত। এইসব অসুবিধা দূর করার জন্য সম্রাট জাস্টিনিয়ান রোমের প্রচলিত আইনের বিজ্ঞান-সম্মত শ্রেণী-বিভাগ করেন এবং লিখিত ভাবে তা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। প্রচলিত আইন সংকলনের জন্য বিখ্যাত আইনবিদ্ ট্রিবোনিয়ানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। আইনগুলি ভালোভাবে পরীক্ষা করা, বিজ্ঞানসম্মতভাবে সেগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করা, পরিষ্কারভাবে তাদের ব্যাখ্যা করা এবং অপ্রচলিত আইন বাতিল করা ছিল এই কমিটির প্রধান দায়িত্ব। এই কমিটি যে আইন সংকলন করেন তা 'দেওয়ানী আইন সংকলন' নামে পরিচিত। এই সংকলন চারটি ভাগে বিভক্ত ঃ প্রচলিত আইন ও সম্রাটদের আদেশ, আইন ও আদেশের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম, ছাত্রদের জন্য রোমের আইন এবং সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আমলের নূতন নূতন আইন।

জাতির সভ্যতার ইতিহাসে সম্রাট জাস্টিনিয়ানের সংকলিত আইনের গুরুত্ব যথেষ্ট। জাস্টিনিয়ানের আইনই সর্বপ্রথম একজন মানুষের সঙ্গে আর-একজন মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে পরিষ্কার নীতি গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে প্রায় পৃথিবীর সকল সভ্য দেশই রোমের আইনের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে নিজেদের আইন তৈরি করেছে। রোমের শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি কালক্রমে অনেক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে, কিন্তু রোমের আইনের গুরুত্ব আজও একটুও কমেনি।

৪র্থ পাঠ—বাইজ্যাণ্টিয়ানের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ঃ

বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের চিত্রকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য অত্যন্ত উন্নত

ছিল। সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইন কনস্ট্যান্টিনোপল শহরের পত্তন করার পর শহরটিকে সুন্দর করে তোলার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। গ্রীকদের বিভিন্ন শহরে যে-সব সুন্দর সুন্দর দেব-দেবীর মূর্তি ও অন্যান্য শিল্পের নিদর্শন তখনও অক্ষত ছিল তিনি সেগুলো সংগ্রহ করে কনস্ট্যান্টিনোপলে নিয়ে আসেন। ফলে কনস্ট্যান্টিনোপল গ্রীক শিল্প-কলা ও স্থাপত্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

সম্রাট জাস্টিনিয়ান চিত্রকলা, অঙ্কনশিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনিই কনস্ট্যান্টিনোপলের বিখ্যাত সেণ্ট সোফিয়া গির্জাটি নির্মাণ করান। নানা রঙের সুন্দর সুন্দর মার্বেল পাথরে তৈরি এই বিশাল এবং সু-উচ্চ সেণ্ট সোফিয়া গির্জা বাইজ্যান্টিয়াম স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। গির্জার প্রাচীরে পাথরের উপর নানা রকম ছবি আঁকা আছে। যীশুখ্রীষ্টের জীবনের বিভিন্ন কাহিনী এইসব ছবিতে দেখানো হয়েছে। যীশুখ্রীষ্টের ভক্তদের মধ্যে ধর্মীয় মনোভাব সৃষ্টি করাই ছিল এইসব ছবির প্রধান উদ্দেশ্য। যীশুখ্রীষ্টের জীবন-কাহিনী নিয়ে নানা রকম ছোট ছোট ছবিও এই সময় আঁকা হয়েছিল। এইসব ছবিগুলো সোনার ফ্রেমে বাঁধানো এবং মূল্যবান পাথর দিয়ে অলঙ্কৃত করা হত। হাতের লেখা পুঁথি-পত্রের উপরও নানারকম সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা হত। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার করার পর সেণ্ট সোফিয়া গির্জাকে মসজিদে পরিণত করে। তারা সেণ্ট সোফিয়া গির্জার অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি এবং স্থাপত্য-শিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি করে।

৫ম পাঠ—ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে বাইজ্যান্টিয়ামের গুরুত্ব ঃ

ব্যবসা-বাণিজ্য—বাইজ্যান্টিয়ামের সভ্যতা গ্রীসের সভ্যতার মতো নগরকেন্দ্রিক ছিল। সাধারণত কোন-না-কোন শিল্পের উপর নির্ভর করেই এইসব নগরের উৎপত্তি হয়। রাজ্যের অভিজাত শ্রেণীর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও ধনী জমিদারশ্রেণীর লোকেরা এইসব নগরে বসবাস করত। এইসব লোকের উপরই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব ছিল। সাম্রাজ্যের শাসকরাও ব্যবসা-বাণিজ্যকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিত। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির উপর ভিত্তি

করেই বাইজ্যান্টিয়ামের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি গড়ে উঠেছিল। পঞ্চম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাইজ্যান্টিয়ামের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সমানভাবে অটুট ছিল। তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের ব্যাপারেও বাইজ্যান্টিয়াম খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। বাইজ্যান্টিয়ামের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মশলা, ঔষধ-পত্র, নানাধরনের সুগন্ধিদ্রব্য, মূল্যবান ধাতু, নানাপ্রকার সুন্দর কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করে ইয়োরোপের দেশ-গুলোতে পাঠাবার ব্যবস্থা করত। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অনেক বড় বড় বাণিজ্য-কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এইসব বাণিজ্য-কেন্দ্রের মধ্যে কনস্ট্যান্টিনোপল, অ্যান্টিয়োক, দামাস্কাস, বেইরুট, স্যালোনিকা করিন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো বাইজ্যান্টিয়ামের শিল্পও যথেষ্ট উন্নত ছিল। এইসব শিল্পের মধ্যে বয়নশিল্পের স্থান ছিল সর্বপ্রধান। কনস্ট্যান্টি-নোপলে অনেকগুলো বয়নশিল্পের কারখানা ছিল। চীন দেশ থেকে রেশমের কাপড় আমদানি করা হত। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে রেশমের কাপড়ের খুব চাহিদা ছিল। সোনা ও রুপোর বিভিন্ন রকমের অলংকার, বিভিন্ন ধাতু দিয়ে তৈরি অনেকরকম জিনিসপত্র, হাতির দাঁতের সুন্দর সুন্দর খেলনা এবং বিভিন্ন ধাতুর তৈরি অস্ত্রশস্ত্র সাম্রাজ্যের অনেক জায়গায়ই তৈরি হত। নিজেদের দেশে ও বাইরের জগতে এইসব জিনিসপত্রের প্রচুর চাহিদা ছিল। দেশের জন-সাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হত। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির উন্নতির ফলে সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। কিন্তু সাধারণ শ্রমিক ও কৃষকদের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। অভিজাতশ্রেণী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকের দুর্দশা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সাহিত্য—সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাইজ্যান্টিয়াম খুব বেশি উন্নত ছিল না। তবু কয়েকজন লেখক সাহিত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের মতো বাইজ্যান্টিয়ামে পুরনো দিনের গ্রীক ও

রোমের সাহিত্যের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের কোন বিরোধিতা ছিল না। এই বিষয়ে পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা খুব উদার ও সহিষ্ণু ছিল। পুরনো কালের গ্রীক সাহিত্য নকল করা আর সেগুলো রক্ষা করার দিকে তাদের প্রচুর ঝোঁক ছিল। তাদের এই চেষ্টার জন্যই গ্রীক সাহিত্য ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়।

বাইজ্যান্টিয়াম সভ্যতার প্রথম যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে প্লুটার্ক ও লুসিয়ানই সবচেয়ে বিখ্যাত। সুইডাস ও মাইকেল সেলাস এই যুগের অন্য দুজন বিখ্যাত সাহিত্যিক। পুরনো দিনের সাহিত্য নকল ও রক্ষা করা ছাড়াও বাইজ্যান্টিয়ামের পণ্ডিতেরা বিশ্বকোষ ও অভিধান রচনা করেন। ইতিহাস, সাধু-সন্ন্যাসীর জীবনী, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও ধর্মশাস্ত্র রচনার ক্ষেত্রে তাঁরা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কবিতা রচনায়ও তাঁরা খুব পারদর্শী ছিলেন। পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটদের মধ্যে অনেকেই পণ্ডিত ছিলেন এবং সাহিত্যিক ও কবিদের তাঁরা নানা-ভাবে উৎসাহ দিতেন। সম্রাটদের মধ্যে কেউ কেউ সাহিত্য রচনায়ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সম্রাট চতুর্থ কনস্ট্যান্টাইন 'প্রথম ব্যাসিলের জীবনী' ছাড়াও শাসনতন্ত্র ও বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। সুইডাস এবং সেলাসও এই যুগের দুজন বিখ্যাত সাহিত্যিক। গ্রীক চার্চের প্রধান যাজকরাও কাব্য ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এইসব ধর্ম-যাজকদের মধ্যে ফোটিয়াসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

দর্শন—বাইজ্যান্টিয়ামে দর্শন-শাস্ত্র বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করে। প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিকদের রচিত গ্রন্থগুলি সেখানে বিশেষভাবে জন-প্রিয়তা অর্জন করে। তবে গ্রীসের দার্শনিকদের মধ্যে বাইজ্যান্টিয়ামে সব-চেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন প্লেটো। মিশরের অধিবাসী প্লোটিনাসের লেখা 'এনিড্‌স' অথবা 'নয়টি অংশ' দর্শনের বই খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যদিও এই সময়ের বাইজ্যান্টিয়ামের দার্শনিকদের মতবাদ বেশ দুর্বোধ্য ও রহস্যময়, তাহলেও ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে তাঁরা যে মতামত প্রকাশ করেন তার মধ্যে অনেক নূতন চিন্তার সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁদের এই নূতন চিন্তাধারা পরবর্তী যুগের মানুষের উপরও বেশ গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

বিজ্ঞান—বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে বাইজ্যান্টিয়ামের অধিবাসীরা যথেষ্ট উন্নত ছিল। গণিতশাস্ত্র, ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্ট্রাবো ও টলেমির নাম বিশেষভাবে পরিচিত। স্ট্রাবোর লেখা 'ভূগোল' থেকে সে-সময়ের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। টলেমি তেরটি খণ্ডে বিভক্ত 'গ্রেট সিনথিসিস' নামে একখানা বিশ্বকোষ রচনা করেন। চন্দ্র, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও পৃথিবীর গতি ও গতিপথ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অনেক ভুলভ্রান্তি থাকলেও তখনকার দিনে এই গ্রন্থের মূল্য ছিল অপরিসীম। জ্যোতিষশাস্ত্রেরও এই সময় যথেষ্ট উন্নতি হয়। রাশিচক্র ও নক্ষত্র সম্বন্ধেও জ্ঞান বেশ উন্নত ছিল।

গ্রীকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয়ের আগে চিকিৎসাবিজ্ঞানে রোমানদের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, পাকা নর্দমার ব্যবস্থা করা, নিয়মিত জল সরবরাহ ও এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়ে তাদের খুব সতর্ক দৃষ্টি ছিল। রোমানরাই সর্বপ্রথম হাসপাতাল তৈরি করার ব্যবস্থা করে। বিশেষভাবে সৈন্যদের চিকিৎসার জন্যই হাসপাতালগুলি তৈরি করা হয়। গাছ, গুল্ম ও লতা প্রভৃতি দিয়ে অনেক ঔষধ-পত্র তৈরি করতেও রোমানরা জানত।

বাইজ্যান্টিয়ামের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে সেলসাস ও গ্যালেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। সেলসাস মেনিনজাইটিস ও অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের উপসর্গগুলো সঠিকভাবে নির্ণয় করেন। তাঁর লেখা 'অন্ মেডিসিন' খুব উন্নত ধরনের গ্রন্থ। গ্যালেন বাইজ্যান্টিয়ামের আর-একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। হিপ্পোক্রাটিসের পর চিকিৎসাশাস্ত্রে আর কেউ গ্যালেনের মতো এত সুনাম অর্জন করেননি। তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উপর দেড়শ বই লেখেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ম, নাড়ীর গতি-প্রকৃতি, স্নায়ু ও পেশী ইত্যাদি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি এসব গ্রন্থে আলোচনা করেন। তবে দার্শনিক মতবাদের সাহায্যে রোগের কারণ নির্ণয় করার ফলে তাঁর সিদ্ধান্তে কিছু কিছু ভুলত্রুটি দেখতে পাওয়া যায়। পল এবং আলেকজাণ্ডার এই যুগের দুজন বিখ্যাত চিকিৎসক।

মনে রাখবে

১. ৩০৬ থেকে ৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কনস্ট্যাণ্টাইন ছিলেন রোম-সাম্রাজ্যের সম্রাট। তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি ছিল যথেষ্ট। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রাজধানীকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে তিনি সাম্রাজ্যের নূতন রাজধানী স্থাপন করেন বাইজ্যান্টিয়ামে। সম্রাটের নাম-অনুসারে এর নাম রাখা হয় কনস্ট্যান্টিনোপল।

২. ব্যক্তিগতভাবে কনস্ট্যাণ্টাইন ছিলেন খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধী। কিন্তু সাম্রাজ্যে ঐক্য ও শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য তিনি খ্রীষ্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম রূপে স্বীকৃতি দেন। নিজেও শেষজীবনে এই ধর্মমত গ্রহণ করেন।

৩. সম্রাট জাস্টিনিয়ান পূর্ব ও পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। জার্মান উপজাতিদের তিনি বহু জায়গা থেকে বিতাড়িত করেন, কিন্তু সুচিন্তিত কোন পরিকল্পনা না থাকায় স্থায়ী ফল পাওয়া যায়নি।

৪. সুবিচারের জন্য লিখিত আইনের প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম জাস্টিনিয়ানই বোধ করেন। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী 'দেওয়ানী আইন সংকলন' তৈরি হয়। পরবর্তীকালে প্রায় সব সভ্য দেশই এই সংকলনের ভিত্তিতে তাদের আইন তৈরি করেছে।

৫. সম্রাট জাস্টিনিয়ানের পৃষ্ঠপোষকতায় বাইজ্যাণ্টাইনের চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পকলার খুব উন্নতি ঘটে।

৬. বাইজ্যান্টিয়ামের সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক। ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে বাইজ্যান্টিয়াম উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিল।

৭. তবে সাধারণ শ্রমিক ও কৃষকদের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না।

অনুশীলনী

১। কনস্ট্যান্টিনোপল শহর কে স্থাপন করেন? কেন এই শহর স্থাপিত হয়? পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যে কিভাবে খ্রীষ্টধর্ম সরকারী ভাবে স্বীকৃতি পায়?

২। সম্রাট জাস্টিনিয়ান কিভাবে দুই রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেন? কেন তাঁর এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়?

৩। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আইন-সংকলন সম্বন্ধে কি জান? তাঁর এই আইন সংকলনের গুরুত্ব কি?

৪। বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে কি জান?

৫। বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:

(ক) সেণ্ট সোফিয়া গির্জা সম্বন্ধে কি জান?

(খ) ট্রিবোনিয়ান কে ছিলেন? তাঁর সংকলিত রোমের আইন ক-টি ভাগে বিভক্ত?

(গ) বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের কয়েকটি বাণিজ্য-কেন্দ্রের নাম লেখ। কোন্ কোন্ বাণিজ্যদ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি ও বিদেশে রপ্তানি করা হত?

(ঘ) বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে কি জান?

(ঙ) বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে দেশে কি পরিবর্তন দেখা দেয়?

৭। সংক্ষীপ্ত টীকা লেখ:

(ক) প্রথম ব্যাসিলের জীবনী; (খ) স্থইডাস; (গ) মাইকেল সেলাস; (ঘ) প্লোটিনাস; (ঙ) টলেমি; (চ) সেলমাস; (ছ) গ্যালেন; (জ) স্ট্রাবো।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলাম ধর্ম—উত্থান ও প্রভাব

১ম পাঠ—আরব ও আরবের অধিবাসী:

আরবদেশের বেশির ভাগ অঞ্চল হয় মরুভূমি না হয় মরুভূমির মতো শুকনো ও অনুর্বর। যেসব অঞ্চলে জল মেলে সেখানে উর্বর জমি, মরূদ্যান ও খেজুরগাছ প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষত, দেশের উত্তর দিকে বর্ষা, শীত ও বসন্তকালে কিছু গাছ-পালা, শাক-সবজি প্রভৃতি জন্মায়। উত্তর দিকে প্যালেস্টাইন থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত মোটামুটি উর্বর জমির সন্ধান পাওয়া যায়। লোহিত সাগরের তীরের জমিও উর্বর এবং কৃষি-কাজের উপযোগী। আরব অঞ্চলের দক্ষিণ সীমান্তে ইয়েমেন এবং উত্তর

দিকের শেষ প্রান্তে হেজ্জাজ। আরবের দুটি প্রধান শহর মক্কা ও মদিনা হেজ্জাজেই অবস্থিত।

আরবের মরুভূমি অঞ্চলে যাযাবর জাতির লোকেরা বাস করত। পশুপালনই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা, চাষের কাজ জানত না। বিভিন্ন জাতি বা দলের মধ্যে সবসময়ই সংঘর্ষ লেগে থাকত। প্রত্যেক জাতিই আলাদা ধরনের রীতিনীতি ও আইনকানুন মেনে চলত। তাদের স্থায়ী বাসস্থান ছিল না—বাস করত তাঁবুতে। নিজেদের ও গৃহপালিত পশুর খাদ্যের সন্ধানে তারা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াত। এইসব যাযাবর জাতিকে বলা হত বেদুইন।

তবে এই বেদুইনদের মধ্যে হেজ্জাজ ও ইয়েমেনের লোকেরাই প্রথম তাদের যাযাবরের জীবন ছেড়ে স্থায়িভাবে বসবাস করতে শুরু করে। ধীরে ধীরে চাষবাসের কাজও তারা শিখে নেয়। এমনকি আবিসিনিয়া আর ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যও শুরু করে। উটের পিঠে চড়ে মরুভূমি পার হয়ে সিরিয়া ও টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী সমৃদ্ধ অঞ্চলের সঙ্গে তারা বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে তোলে। এই সময় আরবে কোন সংগঠিত রাষ্ট্র ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন কথ্য ভাষা ব্যবহার করলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে এবং ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য একটি সাধারণ ভাষা গড়ে ওঠে।

আরবের লোকেরা বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস করত। এক এক অঞ্চলে এক এক দেবতার প্রভাব দেখা যেত। পাথর, গাছ, ঝরনা, কুয়ো প্রভৃতিকে দেবতার মতো তারা পুজো করত। জিন অথবা শয়তানের অস্তিত্বেও তারা বিশ্বাস করত। অনেক জায়গায় দেবতাদের মন্দির ছিল। এইসব মন্দিরের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল মক্কার কাবা মন্দির। এই মন্দিরে অনেক দেবতার মূর্তি ছিল। বহু লোক সেখানে তীর্থ করতে যেত। জাদুবিদ্যা ও অলৌকিক ঘটনায় সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করত। কিন্তু আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বাইরের জগতের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে তাদের পুরনো বিশ্বাস ও ধর্মমতে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে। ইয়েমেন ও হেজ্জাজে ইহুদিদের ধর্মমত বেশ

পরিচিত হয়ে ওঠে। কোন কোন অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম ও জরথুস্ত্র-ধর্ম প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে।

২য় পাঠ—ইসলাম ধর্মপ্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ ঃ

আরবের এই সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার সময় ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা শহরে হজরত মোহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা খুব গরিব ছিলেন। সম্ভবত ছেলেবেলায় মোহাম্মদ লেখা-পড়া শেখারও কোন সুযোগ পাননি। খুব অল্প বয়সেই তিনি খাদিজা নামে একজন ধনী বিধবার অধীনে চাকরি নেন এবং পরে তাঁকে বিয়ে করেন। চাকরি করার সময় সম্ভবত তিনি সিরিয়া, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি স্থানে যান এবং ইহুদি ও খ্রীষ্টানধর্মের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এই দুই ধর্মের মূল কথাই ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণা মোহাম্মদের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় এই মতের উপর ভিত্তি করে তিনিও আরব দেশে একটি নূতন ধর্ম প্রবর্তন করার জন্য ভাবতে থাকেন। বহু দেবতার পুজোর বদলে এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা তাঁর ধর্মের মূলকথা। তাঁর প্রচলিত এই নূতন ধর্ম ইসলাম ধর্ম বা ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের ধর্ম নামে পরিচিত। মোহাম্মদ প্রচার করেন যে ঈশ্বরের প্রধান দেবদূত গ্যাব্রিয়েল তাঁর কাছে এই ধর্মের মূলকথা প্রকাশ করেছেন। মোহাম্মদের স্ত্রী খাদিজা, পোষ্যপুত্র আলি, বন্ধু আবুবকর এবং জেইদ নামে একজন ক্রীতদাস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

কিন্তু মোহাম্মদ এই নূতন ধর্ম প্রচার করতে শুরু করলে মক্কার লোকেরা তাঁর বিরোধী হয়ে ওঠে। এমনকি তাঁকে হত্যা করার জন্যও তারা ষড়যন্ত্র করে। প্রাণ-ভয়ে বাধ্য হয়ে মোহাম্মদ রাত্রির অন্ধকারে আবুবকরকে সঙ্গে নিয়ে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যান। মোহাম্মদের মক্কা থেকে মদিনায় চলে যাবার ঘটনা হিজিরা নামে পরিচিত। এই বছর থেকেই হিজিরা অব্দ গণনা করা হয়।

মদিনার লোকেরা সাদরে মোহাম্মদকে গ্রহণ করে। তাঁর সাত বছরের চেষ্টায় মদিনার প্রায় সমস্ত লোকই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে মোহাম্মদ তাঁর মদিনার শিষ্যদের নিয়ে মক্কায় এসে উপস্থিত হন। মক্কার লোকেরা মোহাম্মদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত আরব দেশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মোহাম্মদের মৃত্যু হয়। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সাধারণভাবে মুসলমান নামে পরিচিত।

মোহাম্মদের ধর্মমত—মোহাম্মদ কখনও নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বলে দাবি করেননি। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের বা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করেন। ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ কোরাণে তাঁর ধর্মমত ও উপদেশ সংকলিত হয়েছে। কোরাণে ১১৪টি অধ্যায় আছে। আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে কোরাণই সবচেয়ে জনপ্রিয়। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা কোরাণকে অভ্রান্ত বলে মনে করে। কোরাণের মূলকথা ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং মোহাম্মদই একমাত্র ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্মপ্রচারক। পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি, প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার, গরিব ও দুঃস্থের উপর দয়া ও সহানুভূতি, সকলের প্রতি ন্যায়বিচার, সৎকাজে স্বর্গ (বেহেশ্‌ত) বাস এবং অসৎ কাজে নরক (দোজখ্‌) বাস --প্রভৃতি ইসলাম ধর্মের অন্যান্য মতবাদ। খ্রীষ্টধর্মের মতো ইসলাম ধর্মও বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পর প্রত্যেক ব্যক্তিই বিচারের জন্য ঈশ্বরের দরবারে উপস্থিত হয়ে পাপ ও পুণ্যের ফল ভোগ করবে। ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

ইসলাম ধর্মের বিস্তারের কারণ—ইসলাম ধর্ম সহজ, সরল ও আড়ম্বরহীন। ফলে আরবের কাছাকাছি অঞ্চলে অতি সহজে এবং খুব তাড়াতাড়ি ইসলাম ধর্ম বিস্তারের সুবিধা হয়। পুরোহিতদের অত্যাচার অথবা শাস্ত্রের অনুশাসনের বাড়াবাড়ি এই ধর্মে নেই। সারাদিনের মধ্যে পাঁচবার মক্কার দিকে মুখ করে ধর্মগ্রন্থ কোরাণ থেকে কিছু অংশ পাঠ করলেই ঈশ্বরের উপাসনা করা যায়। তা ছাড়া জীবনে কয়েকটি সাধারণ নীতি মেনে চলাই ইসলাম ধর্মের মূলকথা। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এই ধর্ম সাধারণ লোকের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

খ্রীষ্টান আর মুসলমানদের সঙ্গে বিরোধের মধ্য দিয়েই ইসলাম ধর্ম অতিদ্রুত প্রসারের সুযোগ পায়। মোহাম্মদ প্রচার করেন যে যারা ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করবে তারা সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে যাবে। সুতরাং মৃত্যুর পর 'শেষ বিচারের দিনে'র জন্য অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা না করে অনেকেই তাড়াতাড়ি স্বর্গে যাবার জন্য আগ্রহী ছিল। পবিত্র কোরান গ্রন্থে বর্ণিত স্বর্গ শুধু সুখেরই স্থান। সেজন্য মুসলমান যোদ্ধারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হত। ফলে প্রায় প্রতিটি যুদ্ধেই তারা জয়লাভ করত এবং পরাজিত শত্রুকে হয় মেরে ফেলত অথবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করত। পরাজিত জাতিরা প্রাণ রক্ষার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত। এভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইসলাম ধর্ম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

৩য় পাঠ—খলিফা—আরব সাম্রাজ্য—কর্ডোভা ঃ

হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর পর মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন আবুবকর। মোহাম্মদের পোষ্যপুত্র ও জামাতা আলিও নেতৃত্বের জন্য আবুবকরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেন। কিন্তু আবুবকর আলির তুলনায় ঐ পদের অনেক বেশি যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সমর্থকদের সংখ্যাও ছিল অনেক বেশি। সুতরাং তখনকার মতো আলির সমর্থকরা হেরে গেল। আবুবকর দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি খলিফা বা উত্তরাধিকারী উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে সিরিয়ার উপর খলিফার কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় এবং সিরিয়ার সমস্ত অধিবাসীকেও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আবুবকরের মৃত্যু হয়।

আবুবকরের পর খলিফার আসন অধিকার করেন ওমর। এরপর মাত্র দশ বছরের মধ্যে পারস্য, মিশর, ফিনিসিয়া, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি অঞ্চল তাঁর দখলে আসে। তিনিই দামাস্কাসে প্রথম মুসলমান সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। ওমরের মৃত্যুর পর খলিফা হন ওসমান। তিনি নিহত হলে খলিফার পদ পান মোহাম্মদের পোষ্য-পুত্র ও জামাতা আলি। কিন্তু এই সময় ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং শত্রুদের হাতে আলি নিহত হন। আলির মৃত্যুর পর খলিফার পদ বংশানুক্রমিক হয়। তাছাড়া এতদিন পর্যন্ত খলিফারা ছিলেন ইসলাম ধর্মজগতের প্রধান গুরু মাত্র। তখন থেকে তাঁরা বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে ওঠেন। ফলে

খলিফার পদ নিয়ে নানারকম ষড়যন্ত্রও শুরু হয়। এই সময় দামাস্কা-সের পরিবর্তে মুসলমান সাম্রাজ্যের নূতন রাজধানী গড়ে ওঠে টাইগ্রিস নদীর পাড়ে বাগদাদে। বাগদাদের খলিফাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন হারুন-অল-রসিদ।

খলিফার পদ নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র দেখা দিলেও আরব সাম্রাজ্যের অগ্রগতি কিন্তু থেমে যায়নি। ইতিমধ্যেই আরব সাম্রাজ্য ভারতের সীমানা থেকে উত্তর-আফ্রিকা পর্যন্ত এবং সেখান থেকে ইয়োরোপের স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বাগদাদ থেকে একজন খলিফার পক্ষে এতবড় বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করা একেবারেই অসম্ভব। ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পরে মিশরের কায়রোতে ও স্পেনের কর্ডোভায় আরও দুজন খলিফার উদ্ভব হয়। ধর্মের ব্যাপারে বাগদাদের খলিফার আনুগত্য স্বীকার করে নিলেও কায়রো ও কর্ডোভার খলিফারা স্বাধীনভাবেই তাঁদের সাম্রাজ্য শাসন করতে থাকেন।



৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আবদ-অর-রহমানের নেতৃত্বে মুসলমানরা স্পেন অধিকার করে। কর্ডোভায় তাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই কর্ডোভা ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের একটি খুব উন্নত কেন্দ্রে পরিণত হয়। কর্ডোভার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সকলের প্রশংসা অর্জন করে। তবে শিক্ষাকেন্দ্র

হিসেবেই কর্ডোভার সুনাম বেশি। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য ছাত্র কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে আসত। অক্সফোর্ড, প্যারিস প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্রীষ্টান ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন গারবার্ট। পরে তিনি রোমের পোপ হন। তখন তাঁর নাম হয় দ্বিতীয় সিলভেস্টার। ইয়োরোপে বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র প্রসারের জন্য তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেন।

৪র্থ পাঠ—মুসলমান শক্তির জাগরণে ইয়োরোপের প্রতিক্রিয়া :

পারস্য, মিশর, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি অঞ্চল জয় করার পর আরবরা কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। তবে ক্রীট ও সিসিলি তাদের অধীনে আসে। দক্ষিণ-ইটালির উপর তারা আক্রমণ শুরু করে। অন্যদিকে ভিসিগথদের পরাজিত করে তারা স্পেনের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। তারপর পিরানিজ পর্বত অতিক্রম করে ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হয়। পশ্চিম-ইয়োরোপের দেশগুলো আরবের আক্রমণকারীদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস মার্টেলের কাছে তুরসের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে দক্ষিণ-ইয়োরোপে আরবদের অগ্রগতি চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তুরসের যুদ্ধকে পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধের ফলেই ইয়োরোপ আরব শক্তির হাত থেকে মুক্তি পায়। প্রকৃতপক্ষে কনস্ট্যান্টিনোপল ও তুরসের যুদ্ধে পরাজিত হয়েই মুসলমানরা ইয়োরোপ জয়ের আশা পরিত্যাগ করে। তুরসের যুদ্ধের পর মুসলমানরা আবার স্পেনে ফিরে আসে এবং প্রায় সাত-শ বছর সেখানে রাজত্ব করে।

৫ম পাঠ—সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতিতে আরবের দান—কয়েকজন মুসলমান পণ্ডিত :

ইসলামের ধর্মের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আরবের জনসাধারণের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। আরবের সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার পর এই পরিবর্তন আরও গভীরভাবে দেখা দেয়। মিশর, সিরিয়া, পারস্য, মেসোপোটামিয়া, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি সুসভ্য অঞ্চল আরব সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে। এইসব দেশের সভ্যতার সঙ্গে মেলা-মেশার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তারা অত্যন্ত দ্রুত উন্নত হয়ে ওঠে।

ভারত ও চীনের সভ্যতার অনেক কিছু তারা গ্রহণ করে। খলিফাদের উৎসাহের ফলে সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। বিভিন্ন জাতির মিশ্রণে গড়ে ওঠা আরবের সভ্যতা মধ্যযুগের ইয়োরোপের সভ্যতার তুলনায় অনেক বেশি উন্নত ছিল।

চীনের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে আরবের লোকেরা কাগজের ব্যবহার শেখে। বাগদাদ থেকে কাগজ মিশর, মরক্কো, স্পেন হয়ে সিসিলিতে পৌঁছয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কাঁচ-শিল্পও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। সিরিয়া ছিল কাঁচ-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। নানা রঙের টালি ইট, বিভিন্ন ধাতুর বাসন-কোসন, স্ফটিক ও মোজেক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তৈরি হত। বয়নশিল্পও উন্নত ছিল। তুলো ও পশমের নানারকম শৌখিন জিনিসপত্র তৈরি করার জন্য পারস্য ও বোখারার খুব সুনাম ছিল। মূল্যবান ধাতুর অলঙ্কার তৈরিতেও কারিগরেরা দক্ষ ছিল। আরবদের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্প ছিল খুব উন্নত। মসজিদ ও রাজপ্রাসাদ গড়ার মধ্যে শিল্পীদের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রীস ও রোমের বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আরবের লোকেরা প্রথম বিজ্ঞান আলোচনা শুরু করে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তারা নূতন নূতন আবিষ্কার করতে থাকে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে হুনিয়ান, ইবন ইশাক, আলি অলতাবারী ও রাজেসের নাম বিশেষভাবে বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগে ইদ্রিসি এবং অল-খোয়ারজামি খুব কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বীজগণিত ও গণিতশাস্ত্রেও অল খোয়ারজামির প্রচুর পাণ্ডিত্য ছিল। সম্ভবত ভারতীয়দের কাছ থেকেই আরবের লোকেরা সংখ্যা ও শূন্যের ব্যবহার শেখে।

আরবের দর্শনশাস্ত্রে গ্রীক ও হিন্দু পণ্ডিতদের গভীর প্রভাব দেখা যায়। আরবের দার্শনিক অল কিন্‌দি প্লেটোর ভক্ত ছিলেন। আরবের আর-একজন দার্শনিক ছিলেন অ্যাভেরোয়েস। তিনি স্পেনে অধ্যাপনা করতেন। আরিস্টটল ছিলেন তাঁর জীবনের আদর্শ।

শিক্ষার বিষয়টিকে আরবের লোকেরা খুব গুরুত্ব দিত। আরবী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হত। সব ছাত্র-ছাত্রীকেই কোরান পড়তে হত এবং কোরানের বিশেষ বিশেষ অংশগুলো মুখস্থ করে রাখার

জন্য খুব জোর দেওয়া হত। স্কুলে ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ, গণিতশাস্ত্র ও কবিতা শেখানো হত।

উচ্চশিক্ষার জন্যও কয়েকটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলোর মধ্যে খলিফা মামুদের প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের 'জ্ঞানের আলয়' খুব বিখ্যাত। কায়রো ও কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয় দুটিও খুব প্রসিদ্ধ ছিল। দূর দূর দেশ থেকেও অনেক ছাত্র এইসব জায়গায় পড়াশুনা করতে আসত। বাগদাদ, দামাস্কাস, কায়রো, কর্ডোভা প্রভৃতি বড় বড় শহরে অনেক গ্রন্থাগারও গড়ে ওঠে। কিন্তু লেখাপড়া শেখার এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও গরিবদের পক্ষে পড়াশুনা করা খুব কঠিন ছিল।

মনে রাখবে

১. আরব দেশের বেশির ভাগ অঞ্চলই মরুভূমি এবং সেখানে যাযাবর-জাতির লোকদের বাস। এদের বলা হত বেদুইন। তাদের প্রধান জীবিকা ছিল পশুপালন।- এক-এক অঞ্চলের লোক এক-এক দেবতায় বিশ্বাসী ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম, ইহুদিদের ধর্মমত ও জরথুস্ত্রের ধর্মমতের প্রভাব ছিল।

২. ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মোহাম্মদের ৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা শহরে জন্ম হয়। গরিব পিতার সন্তান—সম্ভবত ছেলেবেলায় লেখাপড়া শেখার বিশেষ সুযোগ পাননি। ধনী বিধবা খাদিজা বেগমকে বিয়ে করেন।

৩. মোহাম্মদ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। তিনি নিজেকে আল্লাহর প্রতিনিধি রূপে ঘোষণা করেন। তাঁর ধর্মমত ও উপদেশ পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'কোরান'-এ সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটি আরবী ভাষায় লেখা। ইসলাম ধর্মের মূলকথা হল ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। পিতামাতাকে ভক্তি, প্রতিবেশীর প্রতি সদয় ব্যবহার, গরিবের প্রতি দয়া, সকলের প্রতি ন্যায়বিচার, সৎকাজে স্বর্গবাস, অসৎকাজে নরকবাস প্রভৃতি এই ধর্মের অন্যান্য প্রধান মতবাদ। ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের বলা হয় মুসলমান।

৪. ইসলাম ধর্ম সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। পুরোহিতের অত্যাচার বা শাস্ত্রের অনুশাসনের বাড়াবাড়ি এতে নেই। ফলে এই ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষ আগ্রহ বোধ করে। এসব কারণে অতিদ্রুত এই ধর্ম আরব দেশে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া, ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলে স্বর্গবাস হয়, এ বিশ্বাসও ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের ধর্মপ্রচারে উৎসাহ যোগাত।

৫. মোহাম্মদের মৃত্যুর পর মুসলমান-সমাজের নেতৃত্ব যাঁদের উপর পড়েছিল, তাঁরা 'খলিফা' উপাধি গ্রহণ করেন। 'খলিফা' কথাটির অর্থ হল

উত্তরাধিকারী। আবুবকর, ওমর, আলি, হারুন-অল-রসিদ প্রভৃতি হলেন কয়েকজন বিখ্যাত খলিফা। প্রথম দিকে খলিফারা ছিলেন শুধু ইসলাম ধর্ম-জগতের গুরু, পরে তাঁরা রাজনৈতিক প্রধানও হয়ে ওঠেন। একজন খলিফার পক্ষে বাগদাদ থেকে বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করা অসম্ভব হয়ে পড়ায় মিশরের কায়রোতে ও স্পেনের কর্ডোভায় আরও দুজন খলিফার উদ্ভব হয়।

৬. ইসলাম ধর্মের অগ্রগতিতে ইয়োরোপ ভীত হয়ে পড়ে। ইয়োরোপের কিছু কিছু অঞ্চল আরবদের অধিকারে আসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কনস্ট্যান্টিনোপল ও তুরসের যুদ্ধে পরাজিত হলে আরবদের অগ্রগতি বন্ধ হয়।

৭. সেকালের শিক্ষা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্থাপত্য-ভাস্কর্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরবদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। গ্রীস, রোম, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের কাছ থেকে তারা অনেক কিছু গ্রহণ করে নিজেদের জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়িয়ে তুলেছিল। হুনিয়ান, ইবন-ইশাক, আলি অলতাবারী, রাজেস, ইদ্রিসি, অল-খোয়ারজামি, অল-কিন্‌ডি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেকালের কয়েকজন বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত।

অনুশীলনী

১। আরবের অধিবাসীদের সম্পর্কে যা জান লেখ।

২। আরবের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল? তাদের ধর্মমত সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। হজরত মোহাম্মদের জীবনী সংক্ষেপে লেখ।

৪। মোহাম্মদ কেন মক্কা থেকে পালিয়ে মদিনায় যান? মদিনার লোকেরা তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করে? তিনি আবার কিভাবে মক্কায় ফিরে আসেন?

৫। মোহাম্মদের ধর্মমত সম্বন্ধে কি জান?

৬। ইসলামধর্ম কেন অতিদ্রুত বিস্তার লাভ করে?

৭। খলিফাদের আমলে কিভাবে এবং কোথায় কোথায় মুসলমান-সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে?

৮। মুসলমান-শক্তির জাগরণে ইয়োরোপে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়?

৯। সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আরবের দান সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

১০। সংক্ষেপে উত্তর দাও:

(ক) কর্ডোভা কোথায় অবস্থিত? কর্ডোভা কি জন্য বিখ্যাত?

(খ) খলিফা ওমরের সম্পর্কে যা জান লেখ।

(গ) চার্লস মার্টেল কিভাবে মুসলমানদের অগ্রগতি বন্ধ করেন? তুরসের যুদ্ধের ফলাফল কি?

(ঘ) ইসলাম ধর্মের উত্থানের পর আরবের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কিভাবে উন্নতি লাভ করে ?

(ঙ) আরবের শিক্ষা-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল? উচ্চশিক্ষার জন্য মুসলমান শাসকেরা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ?

১১। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) কাদের কাছ থেকে আরবের লোকেরা সংখ্যা ও শূন্যের ব্যবহার শেখে ?

(খ) কোন্ বছর থেকে হিজিরা অব্দ গণনা করা হয় ?

(গ) বাগদাদের খলিফাদের মধ্যে সবচাইতে বিখ্যাত কে ?

(ঘ) কোন্ খ্রীষ্টাব্দে তুরসের যুদ্ধ হয় ?

(ঙ) মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি ?

১২। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :

(ক) কোরান ; (খ) খলিফা আবুবকর ; (গ) 'জ্ঞানের আলয়', (ঘ) খলিফা ওমর ; (ঙ) খাদিজা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যযুগে পশ্চিম ইয়োরোপ

১ম পাঠ—শার্লামন—রোম সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান (৮০০ খ্রীষ্টাব্দ) :

ভূমিকা—পয়তিয়ের বা তুরসের যুদ্ধে ফ্রাঙ্কদের নেতা চার্লস মার্টেলের হাতে মুসলমানরা পরাজিত হয়। তুরসের যুদ্ধে চার্লস মার্টেলের জয়লাভের ফলে মুসলমান শক্তি ও ইসলাম ধর্মের হাত থেকে ইয়োরোপ রক্ষা পেল। কিন্তু রোমের রাজনৈতিক দুর্বলতার জন্য অন্য রকম সমস্যা দেখা দিল। রাজনৈতিক শক্তির অভাব দূর করতে এগিয়ে এলেন রোমের পোপ। তাঁর বুদ্ধি ও কৌশলে পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যে আবার শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং নূতন রাজনৈতিক শক্তির উদ্ভব হয়। রোমের সভ্যতা ও সংস্কৃতিও রক্ষা পায়।

জার্মান উপজাতি ফ্রাঙ্কদের নেতা ছিলেন চার্লস মার্টেল। তিনি ছিলেন গলদেশের তখনকার শাসনকর্তা মেরোভিনজিয়ান পরিবারের অধীনে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। চার্লস মার্টেলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র পেপিন পোপের সম্মতি নিয়ে মেরোভিনজিয়ান শাসককে সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেই সিংহাসন অধিকার

করেন। তখন থেকেই পোপের সঙ্গে ফ্রাঙ্কদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রোমকে সুরক্ষিত করে তোলার জন্যই পোপের একদল শক্তিশালী সমর্থকের প্রয়োজন ছিল ফ্রাঙ্করা সে-অভাব দূর করল।

শার্লামন – পেপিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র চার্লস ৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তিনি কার্লাস ম্যাগনাস বা শার্লামন নামেই বিশেষ ভাবে পরিচিত। ইয়োরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনিই প্রথম প্রায় সমগ্র জার্মানি জয় করে সেখানে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করেন। খ্রীষ্টধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও তিনি খুব সুনাম অর্জন করেন।

চার্লসের রাজ্যের আয়তন বেশ বড় ছিল। রাইন নদী ও পিরানিজ পর্বতের মধ্যবর্তী সমস্ত স্থানের ফ্রাঙ্করা তাঁর অধীনতা স্বীকার করে। ইটালির লোম্বার্ডি ও পোপের রাজ্যও তাঁর অধিকারে আসে। বোহেমিয়া, স্যাক্সনি, ব্যাভেরিয়া, প্যানোলিয়া ও ফ্রিজিয়ার উপর তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। স্পেনেরও কিছু অংশ তিনি অধিকার করেন।



এই সময় রোমের পোপ ছিলেন তৃতীয় লিও। ৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রোমের একদল লোক পোপের উপর খুব অত্যাচার শুরু করে। আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়ে সামরিক সাহায্যের জন্য তিনি চার্লসের কাছে সংবাদ পাঠান। সংবাদ পেয়ে চার্লস একদল সৈন্য

পাঠিয়ে দেন। পোপ তাদের সাহায্যে আবার তাঁর নিজের বাসস্থান ল্যাটেরান প্রাসাদে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পান। পরের বছরে বড়দিনের সময় রোমের সেণ্ট পিটার গির্জায় চার্লস যীশুর উপাসনার জন্য উপস্থিত হন। উপাসনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পোপ তৃতীয় লিও চার্লসের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেন। পোপ তখন তাঁকে রোমের জনসাধারণের সম্রাট বলে সম্বোধন করেন এবং অগাস্টাস উপাধিতে ভূষিত করেন। গির্জায় উপস্থিত ব্যক্তিরাও হর্ষধ্বনি করে পোপের এ-কাজ সমর্থন করেন। তখন থেকে চার্লস শুধু ফ্রাঙ্ক লোম্বার্ড ও অন্যান্য জার্মান উপজাতিদের রাজা নন, তিনি ইয়োরোপের সম্রাট হলেন।

২য় পাঠ—চার্লসের অভিষেকের গুরুত্ব ঃ

পোপ তৃতীয় লিও-র কাছ থেকে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের শুভ বড়দিনে চার্লস রোম সাম্রাজ্যের রাজমুকুট লাভ করেন। সম্রাট এবং অগাস্টাস উপাধিতে ভূষিত হন। কিন্তু এসব উপাধি পাওয়া সত্ত্বেও চার্লসের ক্ষমতা প্রতিপত্তি বা সম্মান কোনভাবেই একটুও বাড়েনি। শুধু সম্রাট হিসেবে তিনি প্রজাদের কাছ থেকে নূতন একটি আনুগত্যের শপথলাভের অধিকার পান। পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটও পশ্চিম সাম্রাজ্যের উপর তাঁর এই নূতন অধিকার স্বীকার করে নেন। কিন্তু অন্যদিকে এই অভিষেকের খুবই গুরুত্ব ছিল। পোপের কাছ থেকে রাজমুকুট লাভ করার ফলে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে এক নূতন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তখন থেকে খ্রীষ্টান ধর্মজগতের প্রধান গুরু পোপের ক্ষমতা ও সম্মান রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে চলে যায়। উত্তর-ইয়োরোপ আবার রোম সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়। মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী সংগঠন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার এই প্রথম সূত্রপাত। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য ও তার রাজধানী রোম তাদের পূর্ব গৌরব আবার ফিরে পায়। তা ছাড়া এতদিন পর্যন্ত রোমের সঙ্গে জার্মানি উপজাতিদের যে দীর্ঘ সংগ্রাম চলছিল তারও অবসান ঘটে। কিন্তু এই অভিষেকের



শার্লামন

ফলে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, কয়েক বছরের মধ্যেই তা তিক্ততায় পরিণত হয়। ক্ষমতার জন্যই ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই ইয়োরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসে বার বার অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

৩য় পাঠ—রাষ্ট্র ও চার্চের সম্পর্ক :

শার্লামন মনে করতেন যে ঈশ্বর নিজের ইচ্ছা পূরণ করার জন্যই তাঁকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছেন। বিশেষত পোপ লিও-র হাত থেকে রাজমুকুট গ্রহণ করার পর তাঁর এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। ফলে তাঁর সাম্রাজ্যের শাসন-নীতি ধর্মের অনুশাসনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। তাঁর শাসনতান্ত্রিক নির্দেশে রাজনৈতিক, নৈতিক এবং ধর্মীয় ব্যাপারের মধ্যে কোনপ্রকার পার্থক্য ছিল না। কারণ তিনি নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনকেও রাজ্যশাসনের অংশ বলেই মনে করতেন। সুতরাং তিনি একদল সুশিক্ষিত, কর্মদক্ষ ও অনুগত যাজক নিযুক্ত করার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি আশা করতেন যে এইসব যাজকের সাহায্যে তিনি তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে পারবেন। তবে বাইজ্যান্টিয়ান সম্রাটদের মতো তিনিও নিজেকেই চার্চের সর্বেসর্বা বলে মনে করতে শুরু করেন। সুযোগ পেলেই তিনি চার্চের সম্পত্তি, চার্চের নিয়ম-শৃঙ্খলা, শিক্ষা, আচার-অনুষ্ঠান, চার্চের সংগঠন, অপরাধী-যাজকদের শাস্তি সম্পর্কে নতুন নতুন আইন বিধিবদ্ধ করতেন। প্রয়োজনবোধে তিনি ধর্মীয় রীতি-নীতিরও কিছু কিছু পরিবর্তন করেন। কোন কোন বিষয়ে তিনি পোপকেও পরামর্শ দিতেন এবং চার্লসের পরামর্শ অনুসারেই পোপের কাজ করতে হত। চার্চের পরিষদের অধিবেশনে চার্লসই সভাপতির আসনে বসতেন। চার্চের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনিই যাজকদের নিযুক্ত করতেন। যাজকরা কিভাবে ধর্মপ্রচার করবে অথবা প্রার্থনার সময় কি গান হবে সে-সম্পর্কেও তিনি নির্দেশ দিতেন। তবে চার্চগুলো যাতে কখনও টাকা-কড়ির অভাব বোধ না করে সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তাঁর এই কঠোর নীতির ফলে প্রথমদিকে চার্চগুলো খুব ভালোভাবে পরিচালিত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই সেখানে নানাধরনের বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখা দেয়।

কিন্তু এভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও শার্লামন মাঝে মাঝে যাজকদের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হতেন। বিশেষত যাজকদের জমি অধিকার করার নীতি তিনি মোটেই সমর্থন করতেন না। যাজকদের বিষয়-সম্পত্তির প্রতি লোভ এবং ধর্মের নামে অধর্মের কাজ করা তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। তবে যাজকদের এসব কাজ পছন্দ না করলেও উপযুক্ত কর্মচারী নিযুক্ত করার জন্য এই যাজকদের উপরই তাঁকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হত। কারণ যাজকশ্রেণী ছাড়া অন্য কোথাও শিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও দক্ষ লোকের সন্ধান পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল।

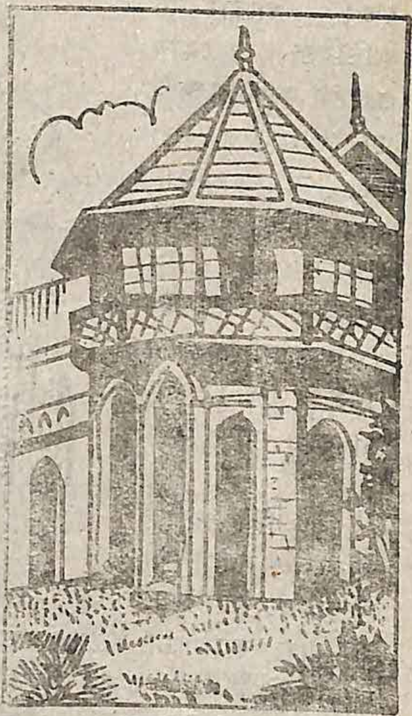
৪র্থ পাঠ—শার্লামনের রাজসভা—শিল্প ও সাহিত্যের কেন্দ্র ঃ শার্লামন পড়তে পারলেও লিখতে জানতেন না। কিন্তু বিদ্যাকে তিনি সম্মান দিতেন, বিদ্বানদের খুব পছন্দ করতেন। তখনকার বড় বড় পণ্ডিতদের তিনি পার্মা শহরে অবস্থিত তাঁর রাজসভায় আশ্রয় দেন। এইসব পণ্ডিতের মধ্যে 'লোম্বার্ডদের ইতিহাস'-এর লেখক পল, কবি থিওডালফ এবং পণ্ডিত অ্যাঙ্গিলবার্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁর রাজসভার সবচেয়ে বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন অ্যালকুইন। তখনকার খ্রীষ্টান জগতে বিখ্যাত ইংলণ্ডের ইয়র্কের স্কুলে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তার পর শার্লামনের আমন্ত্রণে তিনি তাঁর রাজসভায় যোগ দেন এবং রাজপ্রাসাদের স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শার্লামনের রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগের প্রধান উপদেষ্টা হন তিনি। তারপর ৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালকুইন তুরসের মঠের প্রধান যাজক নিযুক্ত হন। ইটালির পিসা শহরের বিখ্যাত দু-জন পণ্ডিত পিটার এবং পলিনাসও চার্লসের রাজসভায় আশ্রয় পান।

চার্লসের সময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কীর্তি আইনহার্ডের লেখা 'চার্লসের জীবনী'। আইনহার্ডের লেখা পড়েই আমরা ইয়োরোপের মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক এবং সবচেয়ে আকর্ষক ব্যক্তির জীবনের অনেক কথা জানতে পারি। আইনহার্ড প্রথম জীবনে চার্লসের রাজ-প্রাসাদের স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তারপর তিনি চার্লসের সভাসদ্, সঙ্গী ও সচিব হিসেবে দীর্ঘদিন সম্রাটের ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পান।

সম্রাট চার্লস বা শার্লামনের যুগ ক্যারোলিঞ্জিয়ান যুগ নামেও পরিচিত। শার্লামনের সুশাসনের ফলে দীর্ঘকাল পরে ইয়োরোপে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। শার্লামন নিজেও ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অনুরাগী। তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টার জন্যই এই সময় শিক্ষা ও সভ্যতার জগতে এক নূতন পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনকে সাধারণভাবে ক্যারোলিঞ্জিয়ান নবজাগরণ বলা হয়। পুরনো দিনের সাহিত্যিকদের রচনা পাঠ করা ও ল্যাটিন ভাষা শেখার দিকে এই সময়ের লোকদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। তবে নূতন নূতন কাব্য-সাহিত্য প্রভৃতি রচনায় ক্যারোলিঞ্জিয়ান যুগের কৃতিত্ব খুবই কম। পুরাতন গ্রন্থ ও পুথি-পত্র সংরক্ষণ এবং শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে বাঁচিয়ে রাখাই এই যুগের প্রধান কৃতিত্ব। শার্লামন পড়তে ভালোবাসতেন কবি ভার্জিল ও হিপ্পোর অধিবাসী অগাস্টাইনের রচনা। লেখা-পড়া শেখানোর জন্য শার্লামন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি স্কুল স্থাপন করেন। সম্রাটের রাজ-প্রাসাদেও একটি স্কুল স্থাপিত হয়। এইসব স্কুলের ছাত্ররাই পরবর্তীকালে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের ধর্মীয় মঠগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করে। শিক্ষা-পদ্ধতির উন্নতির জন্য শার্লামন ইটালি, স্পেন, আয়ারল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ থেকে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করে নিজের দেশে নিয়ে আসেন। এইসব পণ্ডিতদের চেষ্টায় এবং শার্লামনের সাহায্যে ক্যারোলিঞ্জিয়ান যুগে যে নবজাগরণের সূচনা হয় তার জন্য পরবর্তীকালে ফ্রান্স দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র আলোচনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

৫ম পাঠ—ধর্মীয় মঠ—সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী—ধর্মীয় মঠের জীবন ঃ খ্রীষ্টানদের চার্চে ধীরে ধীরে নানারকম বিলাসিতা ও খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধী রীতি-নীতি প্রবেশ করতে থাকে। তখন একদল যাজক এইসব রীতি-নীতির বিরোধিতা করেন। কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায় খুঁজে বের করতে তাঁরা পারেননি। সম্ভবত তখন তাঁরা মিশর, ভারত প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের সন্ন্যাসীদের অনুকরণে নির্জনে বাস, মুক্তি-লাভের চেষ্টা এবং সৎকার্যে জীবন কাটানোর সঙ্কল্প করেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা আলাদা মঠ তৈরি করে বসবাস করতে থাকেন। এইভাবে ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক মঠ গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সন্ন্যাসীর উদ্ভব হয়।

তুরস শহরের বিশপ সেণ্ট মার্টিন তুরস শহরের কাছে মারমাউটিয়ারে ইয়োরোপের মাটিতে সর্বপ্রথম সন্ন্যাসীর মঠ তৈরি করেন। প্রায় আশি জন সন্ন্যাসী সেখানে বাস করতেন। কিছুদিন পরেই সেণ্ট ভিক্টর মার্সাই শহরের কাছে আর-একটি মঠ তৈরি করেন। তিনিই সর্বপ্রথম মঠের সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক আইন-কানুন রচনা করেন। তারপর ইয়োরোপের অনেক স্থানেই মঠ গড়ে উঠতে থাকে। সন্ন্যাসিনীদের জন্যও আলাদা মঠ তৈরি হতে শুরু করে। তবে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের মঠের মধ্যে সেণ্ট বেনিডিক্টের মন্তে ক্যাসিনো এবং বার্গাণ্ডির ক্লুনির মঠ খুবই বিখ্যাত।



ধর্মীয় মঠ

সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের মুক্তির উপায়ের চিন্তা। তাদের প্রধান কর্তব্য ছিল—ভগবানের গুণগান আর তাঁর কাছে প্রার্থনা করা এবং অন্যান্য সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে গির্জার উপাসনায় যোগ দেওয়া। রাত্রি সাড়ে তিনটের সময় তাঁদের ঘুম থেকে উঠতে হত। তারপর খুব ভোরে সূর্যোদয়ের সময়, সকাল আটটার পরে, দুপুরে, সূর্যাস্তের সময় ও শোবার আগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হত। বাকি সময় পড়াশোনা, ঈশ্বরের ধ্যান ও পরিশ্রমের কাজ করে কাটাতে হত। সন্ন্যাসীদের কাছে আলস্য ছিল আত্মার সব চাইতে বড় শত্রু। শীতকালে দিনে একবার এবং গরমের সময় দুবার তাদের প্রচুর পরিমাণে নিরামিষ খাবার খেতে দেওয়া হত। সন্ন্যাসীদের খুবই শারীরিক পরিশ্রম

করতে হত। খেলাধুলা বা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল না। একই শয়নাগারে, তবে আলাদা আলাদা বিছানায় তাদের শুতে হত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন পোশাক-পরিচ্ছদ তাদের দেওয়া হত না। কোন সন্ন্যাসীরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু থাকত না। এমনকি কোন সন্ন্যাসীর পক্ষে নিজস্ব একটা কলম বা বইও রাখা সম্ভব ছিল না।



মধ্যযুগের সন্ন্যাসী

কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও সন্ন্যাসিনীদেরও সন্ন্যাসীদের মতো কঠোর জীবনযাপন করতে হত।

মন্তে ক্যাসিনো মঠের প্রতিষ্ঠাতা সেণ্ট বেনিডিক্ট সন্ন্যাস-জীবনে কঠোর নিয়ম পালন করার নীতি প্রবর্তন করেন। পরবর্তী কালে তাঁর এসব নীতিই অন্যান্য মঠও গ্রহণ করে। বেনিডিক্টের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক সন্ন্যাসীকেই প্রধান সন্ন্যাসীর কাছে মঠের নিয়মকানুন মেনে চলার শপথ নিতে হত। এই শপথকে বেনিডিক্টের শপথ বলে। কোন সন্ন্যাসী মঠের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করলে প্রধান সন্ন্যাসী তাঁকে কঠোর শাস্তিও দিতে পারতেন।

ষষ্ঠ পাঠ—শিক্ষা-বিস্তারে মঠের দান ঃ

প্রথম দিকে ধর্মীয় মঠগুলিকে শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করার কোন ইচ্ছা সেণ্ট বেনিডিক্টের ছিল না। কিন্তু সন্ন্যাসীরা যাতে লেখা-পড়া শিখে ধর্মশাস্ত্র পড়তে পারে তিনি তার ব্যবস্থা করেন। লেখাপড়া-জানা লোকদের তিনি সন্ন্যাস-জীবনে প্রবেশ করার সুযোগ দিতেন। ক্যাসিওডোরাস নামে একজন সন্ন্যাসীই মঠকে শিক্ষার

এবং প্রাচীন সাহিত্য ও প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত করার ব্যবস্থা করেন। প্রথম জীবনে ক্যাসিওডোরাস অস্ট্রোগথদের রাজা থিওডোরিকের অধীনে চাকরি করতেন। পরে তিনি প্রাচীন ও খ্রীষ্টান সাহিত্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও নকল করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই কাজে বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী তাঁকে সাহায্য করেন। ইটালি ও উত্তর-আফ্রিকা হাতে-লেখা থেকে বহু গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার বই তিনি উদ্ধার করেন। তিনি এইসব বই নির্ভুলভাবে নকল করার ব্যবস্থা করেন। ক্যাসিওডোরাস ও তাঁর সন্ন্যাসীরা এইভাবে অনেক পুথি লুপ্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেন। অন্যান্য মঠের সন্ন্যাসীরা, বিশেষত বেনিডিক্টের শিষ্যরাও তাঁদের অনুসরণ করতে শুরু করেন। তাছাড়া বিশপদের অধীন স্কুলগুলো ছাড়া অন্য সব স্কুলের পরিচালনার দায়িত্ব মঠের সন্ন্যাসীরাই গ্রহণ করেন।

সাধারণ শিক্ষা ছাড়া বিজ্ঞান, চিকিৎসা-শাস্ত্র, কারিগরি-বিদ্যা, সঙ্গীতশাস্ত্র, সূচিশিল্প প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়েই সন্ন্যাসীরা খুব দক্ষ ছিল। সাধারণ লোকেরা তাঁদের কাছ থেকে এইসব বিদ্যাও শেখার সুযোগ পেত।

ক্লুনি—৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বার্গাণ্ডিতে ক্লুনির মঠ স্থাপিত হয়। ক্লুনির মঠ সরাসরি পোপের অধীনে ছিল। কোন বিশপ বা প্রধান সন্ন্যাসীর এই মঠের উপর কোন অধিকার ছিল না। সামন্তপ্রথার আইন-কানুন বা বাধা-নিষেধ মেনে চলারও দায়-দায়িত্ব এই মঠের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। সুতরাং রাষ্ট্র ও চার্চের ক্ষমতার বাইরে ক্লুনির মঠ প্রথম থেকেই স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। কয়েক বছরের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে ক্লুনির অধীনে আরও কয়েকটি মঠ তৈরি হয়।

সেণ্ট বেনিডিক্টের নির্দেশ অনুসারে ধর্ম-সংস্কার ছিল ক্লুনির মঠ স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে তিনি সন্ন্যাসীর জীবনে শারীরিক পরিশ্রম অপেক্ষা ঈশ্বরের ধ্যান ও নিজের মুক্তির সন্ধানকেই বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। তিনি সন্ন্যাসীদের কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য পালনের এবং নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধান সন্ন্যাসী স্থির করার উপর আরও বেশি জোর দেন। তবে মঠের সম্পত্তি ঠিকভাবে রক্ষা করা

এবং সম্পত্তি বাড়িয়ে তোলার ব্যবস্থা করার দিকেও তার বেশ সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

ক্লুনির সংস্কারের ফলে অনেক রাজ্যেই বেশ একটু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। জার্মানির গ্রামের দিকের যাজকরা সাধারণত বিয়ে করতেন। জার্মানিতে চার্চের সঙ্গে রাষ্ট্রেরও খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। যাজকরা সাধারণত শাসকদের দ্বারাই নিযুক্ত হতেন। ক্লুনির সন্ন্যাসীরা যাজকদের বিবাহ ও রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল চার্চ—এই দুটোকেই ধর্মশাস্ত্র-বিরোধী কাজ বলে ঘোষণা করেন। পোপ সপ্তম গ্রেগরি ক্লুনির সংস্কারকে ইয়োরোপের সর্বত্র কার্যকর করার চেষ্টা করেন। ফলে এই সংস্কার-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পোপের সঙ্গে সম্রাটের বিরোধ ধীরে ধীরে তীব্র হয়ে ওঠে।

৭ম পাঠ—অভিষেকের সংঘর্ষ ঃ

যাজকদের বিবাহ, ধর্মশাস্ত্র লঙ্ঘন ও শাসকদের দ্বারা যাজকদের অভিষেক বা নিয়োগ ধীরে ধীরে চার্চ ও ধর্মের প্রধান শত্রু হিসেবে দেখা দেয়। ক্লুনির সংস্কারের মূলকথা ছিল ধর্মজীবন থেকে এগুলো দূর করার ব্যবস্থা করা। পোপ সপ্তম গ্রেগরির সময় জার্মানির সম্রাট ছিলেন চতুর্থ হেনরি। গ্রেগরি ক্লুনির সংস্কার কার্যকর করার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করেন। অপর দিকে সম্রাট চতুর্থ হেনরি অর্থের বিনিময়ে যাজক নিযুক্ত করা, যাজকদের নির্বাচনে রাজার প্রভাব কাজে লাগানো এবং যাজকদের অভিষেককে রাজশক্তির অধিকার বলে মনে করতেন। ফলে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। গ্রেগরির মতে ঈশ্বর মানুষের জন্য দুটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন—একটি চার্চ আর একটি রাষ্ট্র। রাষ্ট্র শুধু মানুষের ইহজীবনের অধিকারী, মানুষের চিরকালের মঙ্গলের দায়িত্ব চার্চের। সুতরাং রাষ্ট্রের চেয়ে চার্চের ক্ষমতা অনেক বেশি এবং চার্চের প্রধানরূপে পোপ সে-ক্ষমতার অধিকারী।

অভিষেককে কেন্দ্র করে পোপ ও সম্রাটের বিরোধ বহু দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। অনেক তর্ক-বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়। মধ্যযুগের ইতিহাসে এই ঘটনার খুবই গুরুত্ব আছে। পোপ সপ্তম গ্রেগরি এবং সম্রাট চতুর্থ হেনরির মৃত্যুর পর কোনরকমে এই সমস্যার সমাধান হয়। ১১২২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম হেনরি পোপ দ্বিতীয় ক্যালিক্সটাসের সঙ্গে

এই সম্পর্কে একটি চুক্তি করেন। সম্রাট যাজকদের অভিষেক করার ক্ষমতা ও যাজকদের পদ বিক্রির অধিকার ত্যাগ করেন। তবে যাজকদের নির্বাচনে উপস্থিত থাকার অধিকার ছাড়তে তিনি অসম্মত হন। পোপ সম্রাটের এই দাবি স্বীকার করে নেন। এই চুক্তি অনুসারে পোপ ও সম্রাটের ক্ষমতার লড়াই শেষ হলেও চার্চের দুর্নীতি দূর করা পোপের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

৮ম পাঠ—একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী: মঠ ও চার্চের স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন—কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত—ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক:

মধ্যযুগের প্রথম দিকে মঠ ও বিশপদের অধীনে ক্যাথিড্রাল স্কুল-গুলোই ছিল শিক্ষার কেন্দ্র। কিন্তু প্রাচীনকালের গ্রীক বিজ্ঞান-দর্শন ও রোমের আইনকানুন আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে শিক্ষাজগতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। অপর দিকে, চার্চের বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার জন্য শিক্ষিত, অভিজ্ঞ, দক্ষ ও আইনজ্ঞ লোকের প্রয়োজন ক্রমেই বাড়তে থাকে। এই প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতে শুরু করে। প্যারিস, বোলগনা, অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজ, ভিয়েনা, প্রাগ, হাইডেলবার্গ, লোভেন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের এভাবেই পত্তন হয়। মধ্যযুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি আর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠার অন্য একটি প্রধান কারণ।

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক ও ছাত্রদের সংঘ ছিল। শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষক ও ছাত্ররা সেখানে এসে উপস্থিত হত। চিকিৎসাবিদ্যা, বিজ্ঞান, আইন ও ধর্মশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকদের ডীন বলা হত। সাহিত্য, দর্শন, তর্কবিজ্ঞান প্রভৃতি কলা-বিষয়ের প্রধান অধ্যাপককে বলা হত রেক্টর। চিকিৎসা-বিদ্যা, বিজ্ঞান, আইন আর ধর্মশাস্ত্রের বেশি গুরুত্ব থাকলেও, কলা-বিষয়ে ছাত্রদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। শিক্ষকরা ছাত্রদের বই পড়ে শোনাতেন। বইয়ের সংখ্যা খুব কম ছিল এবং সব বইই অনেক ধৈর্য নিয়ে নকল করতে হত। সুতরাং বইসংগ্রহ করা অনেকের পক্ষেই ছিল অসম্ভব। ছাত্ররা শিক্ষকের পাঠ শুনে মনে রাখার চেষ্টা করত, তারপর তারা পরীক্ষা দিতে বসত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধির জন্য

গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করতে হত। সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করার পর অনেক ছাত্রই তাদের নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে কাজ করত।

এই যুগের পণ্ডিতদের মধ্যে অ্যাবেলার্ড, রবার্ট দ্য সরবোঁ, গ্রেটিয়ান, আর্নালডাস ভিলানোভানাস, রেমণ্ড লুলি, সেণ্ট এন্সেলম প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। পিয়ের অ্যাবেলার্ড ১০৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের ব্রিটানিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্যারিসের ক্যাথিড্রাল স্কুলের ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি নিজেই প্যারিসের কাছে মেলুনে একটি স্কুল স্থাপন করেন। স্বভাবে তিনি নির্ভীক ছিলেন। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শনের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা উপেক্ষা করতেও তিনি কোন দ্বিধা করতেন না। এইজন্য সে যুগের বহু পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দেয়। কিন্তু মধ্যযুগের শিক্ষা ও জ্ঞানজগতের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। তাঁর লেখা দুখানা বিখ্যাত বই 'হ্যাঁ ও না' এবং 'আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী'। 'আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী' থেকে অ্যাবেলার্ডের জীবন সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। ১১৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। অ্যাবেলার্ড ছাত্রদের কাছে খুব প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করেই প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সূত্রপাত।

রবার্ট দ্য সরবোঁ সেণ্ট লুই মঠের যাজক ছিলেন। তিনি ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে হাউস অব সরবোঁ নামে একটি কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখানে ছাত্রদের জন্য আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হত। অল্পদিনের মধ্যেই হাউস অব সরবোঁ খুব জনপ্রিয় হয় এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে।

ধর্মসম্পর্কিত আইনের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন গ্রেটিয়ান। বোল্‌গনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করতেন। রোমের আইনের অনুকরণে তিনি চার্চের বিভিন্ন আইন ও রীতি-নীতির সংকলন করেন। তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ—'পরস্পর-বিরোধী আইনের সামঞ্জস্য'। খ্রীষ্টান জগতের সমস্ত যাজককে এই বইটি পড়তে হত।

আর্দালডাস ভিলানোভানাস ও রেমণ্ড লুলি—দুজনেই বোল্‌গনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। চিকিৎসা ও

রসায়ন শাস্ত্রেও তাঁদের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। ছাত্রদের কাছে স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য আর্নালডাস ভিলানোভানাস ও রেমণ্ড লুলি খুব সুনাম অর্জন করেন।

সেণ্ট এন্সেলম একাদশ শতাব্দীর সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। ১০৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নর্ম্যাণ্ডিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নর্ম্যাণ্ডির বেকের মঠের সন্ন্যাসী ছিলেন। পরে তিনি ইংলণ্ডের ক্যাণ্টারবারির গির্জার আর্চবিশপের পদ লাভ করেন। চার্চের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় উইলিয়ামের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম চালিয়ে যান। দর্শন-শাস্ত্রের উপর তিনি কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এইসব গ্রন্থের মধ্যে 'ঈশ্বর কেন মানুষ হলেন' সবচেয়ে বিখ্যাত।

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের জীবন বর্তমান কালের ছাত্রজীবনের মতো সুশৃঙ্খল ছিল না। কিন্তু তাদের ছাত্রজীবনের কাল ছিল আরও দীর্ঘ। ছাত্ররা সাধারণত যে যেখানে পারত বাসস্থান সংগ্রহ করে নিত। তবে ছাত্রদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের পরিচালিত হোস্টেলে বাস করত। অধ্যাপকেরা সাধারণত ছাত্রাবাসেই বাস করতেন। মোটামুটিভাবে তাঁদের চার বা পাঁচ জন করে এক-এক ঘরে বাস করতে হত। শিক্ষক ও ছাত্রেরা একসঙ্গে থাকত, বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করত। ফলে ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠত।

তের থেকে ষোল বছরের মধ্যেই সাধারণত ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হত। কিন্তু শিক্ষকদের সংখ্যা অল্প থাকার জন্য তাঁদের পক্ষে প্রত্যেক ছাত্রের উপর দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হত না। অনেক ছাত্র পড়াশোনা না করে খেলাধুলা, ঝগড়া-মারামারি করেই সময় কাটিয়ে দিত। পরে এইসব অল্পবয়সী ছাত্রদের জন্যই কলেজ গড়ে উঠতে থাকে। এই কলেজগুলির মধ্যে প্যারিসের রবার্ট দ্য সরবোঁর কলেজ সবচেয়ে বিখ্যাত।

● মনে রাখবে

১. মধ্যযুগে রোমে রাজনৈতিক দুর্বলতা দেখা দিলে পোপ আপন বুদ্ধিবলে ও কৌশলে পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।

একাজে তিনি জার্মান উপজাতি ফ্রাঙ্কদের সাহায্য পেয়েছিলেন। এই ফ্রাঙ্কদের নেতা শার্লামন ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠ শাসক। পোপের বিরোধী একদল লোককে দমন করে তিনি পোপের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন এবং প্রতিদানে পোপ তৃতীয় লিও তাঁর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেন। শার্লামন ইয়োরোপের সম্রাটরূপে স্বীকৃতি পেলেন।

২. পোপ ও সম্রাটের মধ্যে নূতন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পোপের ক্ষমতা ও সম্মান রক্ষার দায়িত্ব গিয়ে পড়ে রাষ্ট্রের উপর। এই অভিষেকের গুরুত্ব এখানে। অন্যদিকে পোপের হাত থেকে রাজমুকুট পাওয়ায় সম্রাট নিজেকে ঈশ্বরের মর্ত্য-প্রতিনিধি বলে ভাবতে শুরু করেন। চার্চের ব্যাপারে কার্যত নিজেকেই তিনি সর্বেসর্বা বলে মনে করতেন।

৩. শার্লামন বিদ্যা ও শিল্পচর্চায় উৎসাহ দিতেন। তাঁর যুগটিকে 'ক্যারোলিঞ্জিয়ান যুগ' বলা হয় এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন দেখা দেয়, সাধারণভাবে তাকে ক্যারোলিঞ্জিয়ান নবজাগরণ বলা হয়।

৪. খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় মঠে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধী রীতি-নীতি প্রবেশ করতে শুরু করে। একদল যাজক এগুলি দূর করতেও সচেষ্ট হন। এদের মধ্যে সেন্ট বেনিডিক্টের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। শিক্ষা-বিস্তারে মঠগুলির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

৫. ৮ম শতাব্দীর শেষে ও ৯ম শতাব্দীর গোড়ায় রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তাতে ক্রমশ চিড় ধরতে থাকে। এই বিরোধের সাময়িক অবসান ঘটে ১১২২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম হেনরি ও পোপ দ্বিতীয় ক্যালিক্সটাসের মধ্যে চুক্তির ফলে। এতে সম্রাট ও পোপ—দুজনেরই ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

৬. প্রথম দিকে মঠ ও ক্যাথিড্রাল স্কুলগুলোই ছিল শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র। পরে বৃহত্তর প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল আসলে শিক্ষক ও ছাত্রদের সংঘ। একত্র বাস ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ফলে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। আইন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, কলা, সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছিল।

অনুশীলনী

১। তুরসের যুদ্ধের পর ফ্রাঙ্করা কিভাবে রোমের পোপের উপর প্রভাব বিস্তার করে?

২। ফ্রাঙ্কদের রাজা চার্লস কিরূপে রোমের সম্রাটের পদ লাভ করেন?

৩। চার্লসের অভিষেকের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৪। চার্লসের সময়ে রাষ্ট্রের সঙ্গে চার্চের কেমন সম্পর্ক ছিল ?

৫। চার্লসের রাজসভা এবং সে-যুগের শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে যা জান লেখ।

৬। ধর্মীয় মঠের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল ?

৭। শিক্ষাবিস্তারে মঠের দান সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

৮। ক্লুনির মঠ সম্পর্কে কি জান ?

৯। অভিষেকের সংঘর্ষের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১০। মধ্যযুগে কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গড়ে ওঠে ? মধ্যযুগে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক ছিল ?

১১। মধ্যযুগের কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১২। মধ্যযুগের ছাত্র-জীবন সম্পর্কে কি জান ?

১৩। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(ক) কিভাবে চার্লস রোমের সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হন ? (খ) চার্চের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য চার্লস কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ? (গ) এগিনহার্ড কে ছিলেন ? তাঁর বই পড়ে কি জানা যায় ? (ঘ) শিক্ষাবিস্তারের জন্য চার্লস কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ? (ঙ) সেণ্ট বেনিডিক্টের সম্পর্কে কি জান ? (চ) ক্লুনির সংস্কারের ফলাফল আলোচনা কর। (ছ) অভিষেকের সংঘর্ষ কিভাবে মীমাংসা হয় ?

১৪। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—

(ক) শার্লামনের যুগের অপর নাম কি ? (খ) ইয়োরোপের কোথায় প্রথম সন্ন্যাসীর মঠ গড়ে ওঠে ? (গ) 'লোম্বার্ডদের ইতিহাসের' লেখক কে ? (ঘ) চার্লসের জীবনী কে লেখেন ? (ঙ) চার্লসের রাজসভার সবচাইতে বিখ্যাত পণ্ডিত কে ছিলেন ?

১৫। সঠিক উত্তরের পাশে √ এই চিহ্ন দাও ঃ—

(ক) চার্লস ৭৬৮/৭৬৯/৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। (খ) ৭৯৯/৮০০/৮০১ খ্রীষ্টাব্দে শুভ বড়দিনে চার্লস রাজমুকুট লাভ করেন। (গ) মন্তে ক্যাসিনো মঠের প্রতিষ্ঠাতা সেণ্ট বেনিডিক্ট / সেণ্ট মার্টিন / চার্লস। (ঘ) পিয়ের অ্যাবেলার্ড ১০৭৯/১০৮০ / ১০৮১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের ব্রিটানিতে জন্মগ্রহণ করেন। (ঙ) ৯০১ / ৯০০ / ৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বার্গাণ্ডিতে ক্লুনির মঠ স্থাপিত হয়।

১৬। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—

(ক) শার্লামনের যুগ — নামেও পরিচিত। (খ) সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের — কথা চিন্তা করা। (গ) সেণ্ট বেনিডিক্টের নির্দেশ অনুসারে ধর্মসংস্কার করাই ছিল — মঠের প্রধান উদ্দেশ্য।

(ঘ) মধ্যযুগের প্রথম দিকে মঠ ও বিশপদের অধীনে ক্যাথিড্রাল স্কুলগুলোই ছিল — —। (ঙ) মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক ও ছাত্রদের — ছিল।

সপ্তম অধ্যায়

মধ্যযুগে ইয়োরোপের সামন্তপ্রথা

১ম পাঠ—সামন্তপ্রথা ঃ

শার্লামনের মৃত্যুর পর বেশ কয়েক'শ বছর ধরে পশ্চিম-ইয়োরোপে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলে। রাজারা ছিল দুর্বল এবং রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে অক্ষম। অরাজকতার জন্য এই যুগে সামন্ত-প্রথার সৃষ্টি হয়। জমির স্বত্বের উপর নির্ভর করে সামন্তপ্রথা গড়ে ওঠে। সামন্তপ্রথা অনুসারে জমির মালিকানা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে নূতন সম্পর্ক গড়ে তোলে। রাজা কয়েকজন শক্তিশালী জমিদারদের কাছে জমি বিলি-ব্যবস্থা করতেন। জমিদাররা আবার সেই জমি ছোট ছোট তালুকদারের কাছে, এবং তালুকদাররা আবার আরও ছোট ছোট মালিকের সঙ্গে সেই জমির বন্দোবস্ত করত। সাধারণত প্রয়োজনের সময় সামরিক সাহায্যলাভের শর্তে এইভাবে জমির বিলি-ব্যবস্থা করা হত। যুদ্ধের সময় বড় বড় জমিদারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সৈন্য দিয়ে রাজাকে সাহায্য করতে হত। জমিদারদের অধীন তালুকদার বা ছোট ছোট জমিদাররা আবার নির্দিষ্ট পরিমাণ সৈন্য দিয়ে তাদের উপরিওয়ালা জমিদারকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকত। সাধারণত কোন সামন্তই নিজ ব্যয়ে বছরে চল্লিশ দিনের বেশি কাজ করতে বাধ্য ছিল না। তবে সামরিক সাহায্য ছাড়া সামন্তদের আরও কয়েকটি কর্তব্য পালন করতে হত। কোন সামন্তের মৃত্যু হলে তার পুত্র যখন সামন্তের পদ লাভ করত তখন উপরিওয়ালাকে তার কিছু নজরানা দিতে হত। তা ছাড়া রাজা বা জমিদার যুদ্ধে বন্দী হলে তাঁর মুক্তিপণ, উপরিওয়ালার বড় মেয়ের বিয়ের সময় যৌতুক ও উপরিওয়ালার বড় ছেলের অভিষেকের সময় অর্থ সাহায্য করতে হত। জমির স্বত্ব ভোগ করার জন্য প্রত্যেক সামন্তই তার উপরিওয়ালার কাছে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য ছিল।

রাজ্যের প্রধান প্রধান সামন্তরা রাজার কাছে এবং অন্যান্য সামন্ত তাদের উপরের সামন্তদের কাছে আনুগত্য স্বীকার করত। তবে সামন্তপ্রথা এবং এই প্রথার সব আইনকানুন একদিনে গড়ে ওঠেনি। কোন রাজার নির্দেশে বা কোন ব্যক্তির ইচ্ছামতো গড়ে ওঠেনি। ধীরে ধীরে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামন্তপ্রথা গড়ে ওঠে এবং মধ্যযুগের অন্যতম শক্তিশালী সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়।

২য় পাঠঃ সামন্ত-যাজকতন্ত্র—ব্যক্তিগত শাসনের যুগঃ

চার্চের প্রভাব ও নানারকম ধর্মীয় আইনকানুনের ফলে সামন্ত-প্রথা আরও জটিল হয়ে পড়ে। চার্চই দেশের অধিকাংশ জমির মালিক ছিল। রোমানদের অথবা ফ্রাঙ্কদের শাসনকালে চার্চ যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত পরবর্তী কালে তার পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। তাছাড়া, জমি থেকেই চার্চের আয় হত সবচেয়ে বেশি। সুতরাং সামন্তদের মতো চার্চও অন্যান্য জমিদারদের সঙ্গে চার্চের জমির বন্দোবস্ত করতে শুরু করে। এই-সমস্ত জমির বণ্টন, আয়-ব্যয়ের হিসাব ভালো করে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সামন্তদের মতো একটা শাসনতান্ত্রিক কাঠামোও চার্চে গড়ে ওঠে। বিশপ ও অন্যান্য যাজকরা তাঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সামন্তদের কাজও করতেন। ফলে ধর্মীয় কাজে যাজকদের প্রায়ই অবহেলা দেখা দিত। জমির মালিক হওয়ার জন্য যাজকদের সঙ্গে দেশের রাজা আর বড় বড় জমিদারদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠত। এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে শাসনতন্ত্রের উপর তাঁরা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতেন।

সামন্তপ্রথার নিয়ম অনুযায়ী যে-সমস্ত সুযোগ ছিল তা ছাড়াও চার্চ আরও কয়েকটি বিশেষ সুযোগ ভোগ করত। চার্চ একটি স্থায়ী সংগঠন। সুতরাং সামন্তদের মৃত্যুর পর তাদের উত্তরাধিকারীদের যে-নজরানা দিতে হত, চার্চের তা কোনদিনই দিতে হত না। যুদ্ধে যোগ দেওয়ার দায়-দায়িত্ব তাদের ছিল না। তবে চার্চের অধীন সামন্তদের সৈন্য দিয়ে রাজাদের সাহায্য করতে হত।

ইয়োরোপের সামন্তদের যুগ ছিল প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের যুগ। রাজা ও সামন্তদের মধ্যে অথবা সামন্তদের নিজেদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকত। এই যুগে যাজকরাই বিরোধ মেটানো এবং শান্তি স্থাপনের

চেষ্টা করতেন। প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার সূর্যাস্তের পর থেকে সোমবার সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার জন্য যাজকরা সবাইকে নির্দেশ দেন। তাঁদের এই নির্দেশের ফলে ইয়োরোপের যুদ্ধ কিছু পরিমাণে বন্ধ হয়।

ব্যক্তিগত শাসনের যুগ—সামন্তপ্রথার আইন অনুযায়ী রাজাই ছিলেন দেশের শাসক। অন্য সব সামন্ত তাঁর প্রজামাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজার সমস্ত ক্ষমতাই সামন্তরা ভোগ করত। রাজা ধীরে ধীরে একজন দুর্বল সামন্তে পরিণত হন। এমন কি সামরিক শক্তির জন্যও রাজাদের সামন্তদের উপর নির্ভর করতে হত। প্রত্যেক সামন্তই তার জমিদারি স্বাধীনভাবে শাসন করত। প্রজারাও তার প্রতিই অনুগত থাকত। ধর্ম, শাসন প্রভৃতি সব বিষয়েই জমিদারই ছিল সর্বেসর্বা। সামন্তদের অনেকেই আগে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিল। শাসনকার্যে তারা ছিল দক্ষ ও অভিজ্ঞ। নিজেদের জমিদারি শাসনের ব্যাপারেও তারা সেই দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগাত। স্থানীয় অভিজাত ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই জমিদাররা নিজের পছন্দমতো লোককে সরকারী উচ্চপদে নিযুক্ত করত। চার্চের প্রধান প্রধান যাজকদের পদও স্থানীয় অভিজাত ও ধনী ব্যক্তিরাই অধিকার করত। এইভাবে রাজ্যের শাসনব্যবস্থা জমিদারদের ব্যক্তিগত শাসন-ব্যবস্থায় পরিণত হয়। বিশেষত দুর্বল রাজাদের আমলে জমিদারেরা দেশের শাসনের ব্যাপারে তাদের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার আরও বেশি সুযোগ পেয়ে যায়। বিচার-বিভাগের অনেক ক্ষমতাই জমিদাররা ভোগ করত। প্রত্যেক জমিদারের অধীনে বিচার-সভা থাকত। স্থানীয় মামলা-মোকদ্দমার মীমাংসা সেখানেই হত। এইসব বিচার-সভায় স্থানীয় সামন্তরা অনেক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। জমিদারদের অধীনে বিচার-সভা গড়ে ওঠার ফলে রাজার ক্ষমতা আরও কমে যায়, আর জমিদারদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়তে থাকে।

৩য় পাঠ—ইয়োরোপের শান্তিরক্ষায় জমিদারদের দুর্গ ও সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্য ঃ

সামন্তদের সমাজ প্রকৃতপক্ষে যোদ্ধার সমাজ। শত্রুদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য বড় বড় সামন্তরা দুর্গ নির্মাণ করত।

প্রথমযুগে সামন্তদের দুর্গগুলো খুব সাধারণভাবে তৈরি করা হত। দুর্গের চারদিক ঘিরে থাকত কাঠের প্রাচীর আর পরিখা। দুর্গ এবং দুর্গের বুরুজ কাঠ দিয়েই তৈরি হত। পরবর্তী কালে দুর্গ ও দুর্গের প্রাচীর কাঠের বদলে পাথর দিয়ে বানানো হতে থাকে। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে পাথরের দুর্গ-প্রাচীরে বুরুজ তৈরিও শুরু হয়। প্রত্যেক দুর্গেই খুব উঁচুতে পাথরে-তৈরি একটি বুরুজ থাকত। সেখানে তৈরি হত দুর্গের কারাগার। কারাগারের উপর থাকত একটি প্রশস্ত পাটাতন। প্রহরীরা সেখান থেকে দুর্গ পাহারা দিত। শত্রু যদি কখনও পরিখা পেরিয়ে দুর্গের বাইরের প্রাচীর অধিকার করত, তাহলে দুর্গের সৈন্যরা কারাগারের পাটাতনে আশ্রয় নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। শত্রুদের পক্ষে দুর্গের এই অংশ অধিকার করা ছিল খুবই কঠিন।



মধ্যযুগের দুর্গ

সাধারণ লোকের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্যই মধ্যযুগে সামন্ত-প্রথার উদ্ভব। ঐ উদ্দেশ্যেই সে-যুগে সামন্তরাও তাদের দুর্গগুলো নির্মাণ করে। শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিলে কাছাকাছি অঞ্চলের লোকেরা এসে দুর্গে আশ্রয় নিত। দীর্ঘকাল পর্যন্ত শত্রুর

আক্রমণ যাতে প্রতিরোধ করা যায় সেজন্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য এবং যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম দুর্গে মজুত রাখা হত। কামান আবিষ্কৃত হওয়ার আগে আক্রমণকারীদের পক্ষে এইসব দুর্গ অধিকার করা ছিল খুবই কঠিন কাজ। ফলে মধ্যযুগে এইসব দুর্গ স্থানীয় লোকের স্বাধীনতা, জীবন ও বিষয়-সম্পত্তি রক্ষায় খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

মধ্যযুগে সাধারণ লোকের জীবন ও বিষয়-সম্পত্তি রক্ষায় সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্যদেরও গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা ছিল। সাধারণ লোকের পক্ষে ঘোড়া, যুদ্ধের পোশাক ও প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র যোগাড় করা খুব সহজ ছিল না। এসব সংগ্রহ করার জন্য প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন হত। দ্রুতগামী অশ্ব, দুর্ভেদ্য বর্ম এবং তীক্ষ্ণ অস্ত্রের অধিকারী ও সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হত না। এইসব সৈন্যের সাহায্যেই ইয়োরোপের লোকেরা মধ্যযুগে বাইরের আক্রমণকারীদের হাত থেকে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করত।

৪র্থ পাঠ—মধ্যযুগের ইয়োরোপের জীবনযাত্রার সঙ্গে সামন্তপ্রথার সম্পর্ক :

সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে মধ্যযুগের সামন্তপ্রথার গুরুত্ব যথেষ্ট। অহেতুক যুদ্ধ এবং বিনাকারণে রক্তপাতই সামন্তপ্রথার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। রাজ্যের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূর করার উদ্দেশ্যে স্বাভাবিকভাবেই সামন্তপ্রথার সৃষ্টি। অল্পদিনের মধ্যেই সামন্তরা দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করতে সক্ষম হয়। যতদিন পর্যন্ত ইয়োরোপের রাজারা আবার দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারেননি ততদিন পর্যন্ত সামন্তরা সাময়িকভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার মতো শাসনতন্ত্র ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থানে প্রবর্তন করে। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক রাষ্ট্রগুলি সমাজের জন্য যেসব কাজ করে, সামন্ততন্ত্র সে-যুগে তাই করত। সামন্তদের নেতৃত্বে রাজনৈতিক অরাজকতার মধ্য থেকেই ধীরে ধীরে নূতন একরকম শৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আগে অপরাধীর শাস্তির জন্য দৈহিক শক্তির প্রয়োগ করা হত, পরে এইযুগে ধীরে ধীরে বিচার-বিভাগের সূচনা হয়। সামাজিক আচার-ব্যবহারের উপর ভিত্তি

করেই আইনকানুনের সৃষ্টি আর প্রভুভক্তি থেকেই দেশপ্রেমের সূত্রপাত ঘটে। সামন্তরাই মধ্যযুগের সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে ও উন্নত করতে সচেষ্ট হয়। তাদের চেষ্টাতেই ইয়োরোপে সর্বপ্রথম কয়েকটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ব্যক্তি-স্বাধীনতাও এই যুগেই প্রথম দেখা দেয়। মধ্যযুগের লোকেরা দেশের শাসন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সামন্তদের এই কৃতিত্বকে খুব প্রশংসার চোখে দেখতে শুরু করে। দীর্ঘদিন অশান্তি আর অরাজকতার পর এই নূতন ধরনের শাসনতন্ত্র সাধারণ লোকের জীবনে শান্তি আর নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়। সামন্তদের রাজনৈতিক সংস্থাকেই তারা আদর্শ বলে মনে করতে থাকে।

শুধু রাষ্ট্রশাসন এবং রাজনীতিতে নয়, অর্থনৈতিক জীবনেও সামন্ত-প্রথা অনেক পরিবর্তন নিয়ে আসে। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য আবার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। নূতন নূতন বাণিজ্য-কেন্দ্রও গড়ে ওঠে। মধ্যযুগেই ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থানে অনেক নূতন শহরের পত্তন হয়। শহরগুলো সাধারণত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকত। এইসব শহরে ব্যবসায়ীরা নিরাপদে ব্যবসাবাণিজ্য করার সুযোগ পেত। শহরগুলো অনেক সময় নদীর তীরে গড়ে উঠত। ফলে ব্যবসায়ীরা নৌ-পথেও বাণিজ্য করার সুযোগ পেত। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মধ্যযুগের মানুষের সামাজিক জীবনেও অনেক পরিবর্তন এনে দেয়। মধ্যযুগে বেশির ভাগ লোকের জীবনযাত্রা সাধারণত খুব সুখের ছিল না, তবে নূতন নূতন কাজের সম্ভাবনায় তাদের জীবনে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। সমাজে এই যুগেই পরিষ্কারভাবে তিনটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়—অভিজাত, যাজক ও সাধারণ লোক। তাদের জীবনযাত্রার মধ্যে প্রচণ্ড পার্থক্যের সৃষ্টি হতে থাকে। তবে মধ্যযুগের মানুষ তখনও এই পার্থক্যের কারণ খুঁজতে আরম্ভ করেনি। কারণ তারা এই শ্রেণীবিভাগকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিত। সামন্তপ্রথার কুফলগুলোও তখন তারা বুঝতে পারেনি। যে সামন্তপ্রথা সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে ইয়োরোপে গড়ে উঠেছিল, তা যে ধীরে ধীরে ইয়োরোপের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ-জীবনকে একেবারে গ্রাস করে নিচ্ছে তা শুধু সাধারণ লোক কেন, অন্যেরাও তখন বুঝতে পারেনি।

৫ম পাঠ—শিভ্যালরি ঃ

মধ্যযুগের নাইট বা বীরদের বীরধর্ম ও রীতি-নীতিকে শিভ্যালরি বলে। প্রত্যেক সমাজেই সম্ভ্রান্ত লোকদের কোন-না-কোন আদর্শ থাকে, সামন্তদের সমাজেও তার কোন ব্যতিক্রম ছিল না। মধ্যযুগের প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত লোকই ছিলেন বীর যোদ্ধা এবং জীবনে তাঁরা কতকগুলো নীতি মেনে চলতেন। সামন্তযুগের প্রথম দিকে সবসময়ই যুদ্ধ লেগে থাকত। সে-সময় অসমসাহসী বীর যোদ্ধারাই ছিলেন সকলের চোখে আদর্শ। মরতে যারা ভয় পায় না, কথার যারা খেলাপ করে না, যারা প্রভুর একান্ত অনুগত এবং নিজের প্রাণের বিনিময়েও যারা সামন্তদের রক্ষা করতে প্রস্তুত—তাদেরই আদর্শ বীর যোদ্ধা মনে করা হত। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলার জন্য তাদের সৈন্যদের মতো কঠোর সামরিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রথম জীবনে তাদের সম্ভ্রান্ত জমিদারের বাড়িতে বালক-ভৃত্য হিসেবে কাজ করতে হত। তারপর সে হত জমিদারের পার্শ্বচর এবং তার ঘোড়া, বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র রক্ষার দায়িত্ব পেত। তখন তাদের বলা হত স্কোয়ার। যৌবনে সে নাইট বা যোদ্ধার পদ লাভ করত। নাইট উপাধি লাভ করার জন্য তাকে অস্ত্রচালনায় কৃতিত্বের প্রমাণ দিতে হত আর যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের। প্রতিটি পরীক্ষায় ঠিক ঠিক উত্তীর্ণ হতে পারলে সে সম্মানিতভাবে নাইটের দলে স্থান পেত। প্রথম দিকে নাইট উপাধি পাওয়ার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দী



নাইট

থেকে নাইট উপাধিতে ভূষিত হওয়ার আগে প্রত্যেক যোদ্ধার পক্ষেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার জন্য চার্চে একরাত্রি বাস করা, যীশুখ্রীষ্টের ভোজের উৎসবে যোগ দেওয়া এবং পুরোহিতদের উপদেশ শোনা বাধ্যতামূলক ছিল। নাইট উপাধির জন্য যোদ্ধারা প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় করত। তাদের নিজেদের অর্থেই অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম, ঘোড়া, একজন স্কোয়ার এবং কয়েকজন চাকর সংগ্রহ করতে হত। এজন্য অনেক যোদ্ধাই নাইট হওয়ার সুযোগ পেত না, হয়ত তাকে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে হত স্কোয়ার হিসেবেই।

ত্রুব্যাদুর—একাদশ শতাব্দীর ফরাসী দেশের গীতিকাব্য-রচয়িতা কবিরা ত্রু ব্যাদুর নামে পরিচিত। মধ্যযুগে সমগ্র পশ্চিম-ইয়োরোপের সাহিত্যের কেন্দ্র ছিল ফরাসী দেশ। এই যুগে উত্তর-ফ্রান্সের কবিরা মহাকাব্য পছন্দ করতেন, আর দক্ষিণ-ফ্রান্সের কবিরা পছন্দ করতেন গীতিকাব্য। দক্ষিণ-ফ্রান্সের প্রোভেন্স অঞ্চল গীতিকাব্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রায় পাঁচশ জন কবির নাম জানা যায়—যাঁরা অসংখ্য গীতিকবিতা রচনা করেন। ভাব, ভাষা ও ছন্দে এইসব কবিতা অপূর্ব। তাঁদের সব কবিতাই প্রেমের কবিতা। সাধারণত বড় বড় সামন্তদের দরবারে কবিরা সুর দিয়ে এইসব কবিতা গেয়ে শোনাতেন। দক্ষিণ-ফ্রান্সের প্রায় সব সামন্তের দরবারেই তাঁদের খুব সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। দক্ষিণ-ফ্রান্সের কবিদের মধ্যে আরনোৎ দ্য ম্যারিয়্যুল, বার্নার্দ দ্য ভেন্তাদুর, পিয়ের কার্ডিন্যল, র‍্যাম্বাত দ্য ভ্যাকুয়ারস প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ষষ্ঠ পাঠ—জমিদারের খাস জমি ও খামার-ব্যবস্থা ঃ

সামন্তপ্রথার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—খামারবাড়ি—সামন্তপ্রথার রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রধান কেন্দ্র ছিল জমিদারদের খাস জমি ও খামারবাড়ি। গ্রামের সমস্ত শ্রমিক জমিদারের জমিতে চাষ-বাস করত। খামারবাড়িগুলো সাধারণত একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত। তবে কখনও কখনও একটি খামারবাড়ির অধীনে কয়েকটি গ্রামও থাকত। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের সব-কিছুই খামারবাড়ির জমিতে পাওয়া যেত। এমনকি চাকাওয়ালা গাড়ি, একজন ছুতোর মিস্ত্রি ও একজন কামারও খামারবাড়িতে থাকত।

খামারবাড়ির সঙ্গে যুক্ত বিচার-সভার সাহায্যে জমিদার কৃষকদের উপর তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পেত। কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম ও তাদের দেওয়া খাজনার উপর নির্ভর করে অভিজাতদের সামন্তপ্রথা গড়ে ওঠে। কৃষিই ছিল মধ্যযুগের অর্থনীতির প্রধান বনিয়াদ। কৃষকরা জমি চাষ করে প্রচুর ফসল ফলাত। আর জমির মালিক সামন্তরা শিকার ও যুদ্ধ করে মনের আনন্দে জীবন কাটিয়ে দিত। প্রচুর অর্থব্যয়ে তারা দুর্গ আর গির্জা তৈরি করাত।



খামারবাড়ি

মধ্যযুগে ইয়োরোপের প্রায় শতকরা নব্বইজন লোক কৃষিকাজ করত আর বাকি দশজন ছিল জমিদার এবং যাজক। জমিদার ও যাজকরাও তাদের জীবিকার জন্য কৃষকদের উপরই নির্ভর করত। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের অর্থনীতি পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল কৃষির উপর। মধ্যযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার ব্যাপারেও কৃষক এবং কৃষির দান সবচেয়ে বেশি।

খামারের শাসন-ব্যবস্থা—প্রত্যেক খামারেই সুষ্ঠুভাবে স্থানীয় শাসন পরিচালনা এবং কৃষিকাজের উন্নতির জন্য কয়েকজন কর্মচারী নিযুক্ত হত। খামারের গোমস্তা ও পেয়াদারা ছিল জমিদারের নিজস্ব কর্মচারী। তা ছাড়া, খামারে কৃষকদের মনোনীত আরও কয়েকজন কর্মচারী থাকত। প্রত্যেক খামারে একজন করে সাধারণ পরিদর্শকও থাকত। একজন স্বাস্থ্যবান কিন্তু নিষ্ঠুর প্রকৃতির

লোককে খামারের পাহারাদার নিযুক্ত করা হত। বন্য-পশুরা খামারে ঢুকে যাতে চাষের জমি নষ্ট না করতে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখাই ছিল তার প্রধান কাজ। চাষীরা যাতে আনন্দে ফুর্তিতে দিন কাটাতে পারে, নিয়মিত গরু ও মহিষের পরিচর্যা করে, সেদিকেও তাকে দৃষ্টি রাখতে হত। ভালোভাবে গোশালা দেখাশোনার জন্য গোশালার একজন কর্ত্রী নিযুক্ত হত। গরু, ভেড়া, শুয়োর চরাবার জন্য আলাদা আলাদা লোক নিযুক্ত থাকত। জমিদারের খাস-জমি চাষ করতে গিয়ে কৃষকরা যদি কাজে কোনরকম ফাঁকি দিত তাহলে তাদের খুব মারধর করা হত।

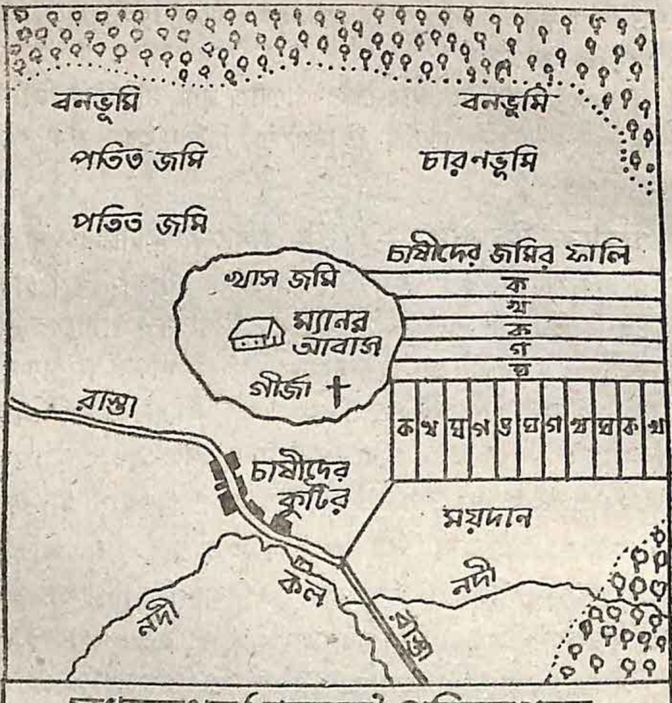
সাধারণত প্রত্যেক খামারেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র উৎপন্ন হত। এইসব বাড়তি জিনিসপত্র বিক্রি করার জন্য আলাদা লোক থাকত।

খামারের বিচারালয়—প্রত্যেক খামারেই বিচারের জন্য একটি করে বিচারালয় থাকত। খামারের প্রত্যেক অধিবাসীই বিচারালয়ে উপস্থিত হতে বাধ্য ছিল। বিচারালয় সাধারণত খামারের গির্জায়, খামারবাড়ির হলঘরে অথবা বাইরে কোন গাছের ছায়ায় বসত। এই বিচারালয়ের মাধ্যমেই সম্পত্তির উপর জমিদারের অধিকার এবং গ্রামবাসীদের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী অধিকার সাব্যস্ত হত। বিচারালয়ে কৃষকদের ডাকা হত এবং প্রথা অনুযায়ী অভিযোগের বিচার করা হত। কোন চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘনের জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কৃষকেরা নিজেরাই ঠিক করত। বিবাদ-নিষ্পত্তির পর জমিদার অথবা কৃষকদের নামে বিচারের রায় দেওয়া হত। পরবর্তী কালে খামারের আইনকানুন ও বিচারের রীতি-নীতি লিখিতভাবে তৈরি করা হয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই জমিদারের স্বার্থে-ই এই আইন তৈরি করা হত। তখন থেকেই বিচারালয়ের পক্ষে কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিচারালয়ে যে জরিমানা আদায় হত তার সবটাই ছিল জমিদারের প্রাপ্য। এই জরিমানা থেকেও জমিদারের বেশ কিছু আয় হত।

৭ম পাঠ—খামারের অর্থনৈতিক অবস্থা: গ্রামবাসীর যৌথ চাষ-প্রথা:

ছোট জমিদারদের একটিই খামার থাকত। কিন্তু বড় বড় জমিদাররা

ছিল অনেকগুলো খামারের মালিক। সাধারণত ন-শ থেকে দু-হাজার একর চাষবাসের জমি নিয়ে একটি খামার গড়ে উঠত। তার সঙ্গে ছিল ঘাসে-ঢাকা জমি, পশুচারণের জমি, বনজঙ্গলে ঢাকা জমি ও পতিত জমি। জমিদারের যে খাস-জমি থাকত তা ওইসব জমি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এইসব জমি একসঙ্গে মিলেই গড়ে উঠত জমিদারের জমিদারি।



মধ্যযুগের 'ম্যানর' পরিকল্পনা

চাষের জমির চারদিকে সাধারণত কোনরকমের বেড়া দেওয়া থাকত না। গ্রামের কৃষকদের সাহায্যে জমি চাষ, বীজ বোনা এবং ফসল কাটার কাজ করা হত। অপরের সাহায্য ছাড়া কোন কৃষকেরই একা এসব কাজ করা সম্ভব হত না। হয়ত কোন কৃষকের লাঙ্গল আছে, কিন্তু লাঙ্গল টানার জন্য বলদ নেই। পাথর আর কাঁকরে ভরা জমি পরিষ্কার করে চাষের উপযোগী করে তোলাও ছিল খুব কঠিন কাজ। বনজঙ্গলে ভরা জমি পরিষ্কার করাও

একজন চাষীর পক্ষে কখনও সম্ভব ছিল না। চাষবাসের যন্ত্রপাতিও ছিল অত্যন্ত সেকেলে ধরনের। তা ছাড়া, তখনকার বলদগুলো বর্তমান কালের বলদের চেয়ে আকৃতিতে ছোট আর শারীরিক শক্তিতে দুর্বল ছিল। মোটামুটিভাবে সেগুলো দেখতে ছিল আজকের দিনের বকনা বাছুরের মতো। চাষের সময় গ্রামে যে দশ বা বার জোড়া বলদ পাওয়া যেত, তাদের সবগুলোকেই একসঙ্গে লাঙ্গলের জোয়ালে বেঁধে দেওয়া হত। জমির ফসল ঘরে তোলার সময়ও চাষীদের একসঙ্গে কাজ করার দরকার হত। যব, গম, জই প্রভৃতি পেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো ঘরে তুলতে হত। না হলে পাকা শস্যের অনেকটাই মাঠে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত। তাই তাড়াতাড়ি ফসল তোলার জন্য গ্রামের স্ত্রী, পুরুষ, শিশু—সবাই একসঙ্গে ফসল কাটতে লেগে যেত। ফসল কাটা শেষ হয়ে গেলে সমস্ত শস্যক্ষেত্র গ্রামবাসীদের পশুচারণের ক্ষেত্রে পরিণত হত।

খামারের চাষের উপযোগী জমিকে তিন ভাগে ভাগ করা হত। শরৎকালে তার একভাগে যব, গম প্রভৃতি বোনা হত। গ্রীষ্মকালে এইসব জমির ফসল পাকত। আর একভাগ জমিতে বার্লি, যব, জই, শিম প্রভৃতি বোনা হত। গ্রীষ্মকালের শেষ দিকে এইসব ফসল পেকে উঠত। উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য বাকি জমি সে বছর ফেলে রাখা হত। পরের বছর এই জমিতে ফসল বোনা হত, কিন্তু অন্য জমিতে চাষ করা হত না। এইভাবে সব জমির উর্বরতা-শক্তি বাড়িয়ে তোলার ব্যবস্থা ছিল।

কৃষকদের পরিশ্রম ও খাজনা—মধ্যযুগের ইয়োরোপে বস্তুতপক্ষে কৃষক ও ভূমিদাসদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। সে-যুগে কৃষকদের সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হত। প্রত্যেক চাষীরই নিজের অধীনে জমি থাকত বিশ থেকে ত্রিশ একর। সেসব জমি চাষ করার পর তাকে আবার জমিদারের খাস জমিতে কাজ করতে হত। কৃষকদের পক্ষে জমিদারের জমিতে ভূমিদাসের মতো কাজ করাই ছিল খামারপ্রথার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সামন্তপ্রথার নিয়ম অনুযায়ী ভূমিদাসেরা জমিদারদের সবরকম কাজ করতেই বাধ্য ছিল। এমনকি কখন তাদের কোন্ কাজ করতে হবে, সে-সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। পরবর্তী কালে কৃষকদের সপ্তাহে তিনদিন করে দুটো বলদ

নিয়ে জমিদারের জমিতে কাজ করতে হত। এই তিন দিনেই চাষ, বীজ রোয়া, জমি পরিষ্কার করা এবং ফসল কাটার কাজ শেষ হত। ফসল কাটা বা অন্য কোন সময় বেশি কাজের প্রয়োজন দেখা দিলে কৃষকরা জমিদারের নির্দেশে আরও বেশি কাজ করতে বাধ্য হত। জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা, গোলাবাড়িতে শুকনো খড় রেখে দেওয়া এবং শস্যভাণ্ডারে ফসল তোলার কাজও তাদের করতে হত। তাছাড়া রাস্তা তৈরি, পুল মেরামত, কুয়ো খোঁড়া, নর্দমা কাটা ও দুর্গ-পরিখা পরিষ্কার করার জন্য তাদের বেগার খাটার নিয়ম ছিল। কৃষকদের স্ত্রী আর ছেলেদেরও খামারবাড়ির অনেক কাজে লাগানো হত। সব সময়ই জমিদারের কাজই বেশি গুরুত্ব পেত। জমিদার ও খামারের কাজ করে বাকি যে সময়টুকু থাকত, সেই সময়ের মধ্যেই তাদের নিজেদের কাজ শেষ করতে হত। তবে শুধু দৈহিক পরিশ্রম করেই কৃষকরা রেহাই পেত না। তাদের আয়ের একটা বিরাট অংশই খাজনা হিসেবে জমিদাররা আদায় করে নিত।

৮ম পাঠ—কৃষকদের জীবনযাত্রা—জমিদার ও চার্চের কর :

জীবনযাত্রা—খামারের গ্রামে সাধারণত বার থেকে পনেরটি পরিবার বাস করত। বড় গ্রামে পঞ্চাশ থেকে ষাটটি পরিবারও বাস করত। এইসব গ্রামে কৃষকদের খুব একঘেয়ে জীবন কাটাতে হত। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জানালাহীন খড়ের ঘরে—বিড়াল, কুকুর, হাঁস, মুরগি প্রভৃতির সঙ্গে একঘরেই বাস করতে হত। রাতে ঘরে আলো জ্বালার কোন ব্যবস্থা ছিল না। অবশ্য কৃষকদের মধ্যে কেউই লিখতে-পড়তে জানত না, তাই আলোর প্রয়োজনও ছিল তাদের খুব কম।

কৃষকদের ঘরের সঙ্গেই একফালি জমি থাকত। সেখানে শাক-সবজির চাষ হত। টাটকা মাছ-মাংস তাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হত না। মোটা রুটি, শাক-সবজি, দুধ আর মাখনই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। ভালো এবং সুস্বাদু খাদ্য ও গরম জামা-কাপড় তাদের পক্ষে সংগ্রহ করা অসম্ভব ছিল। অনেকে দু-বেলা পেটপুরে খেতেও পেত না। দুর্ভিক্ষের সময় কৃষকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হত।

কৃষকদের এই জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তুলত অমানুষিক

পরিশ্রম, বাধ্যতামূলক কাজ এবং নানারকম খাজনা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের বিভিন্নভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। জমিদারের ভয়ে বাড়িতে বসে বিশ্রাম করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। বৃষ্টি, ঝড়, তুষারপাত, ঘূর্ণিঝড়—সব-কিছু উপেক্ষা করেও তাদের কাজ করতে হত। এত পরিশ্রম করে সারাবছর ধরে কৃষকরা যে সামান্য অর্থ সঞ্চয় করত তা-ও তাদের রক্ষা করা সম্ভব হত না। সুযোগ পেলেই জমিদাররা সে সামান্য অর্থও কেড়ে নিত। যোদ্ধারা তাদের মাইনে পেয়েই সন্তুষ্ট হত না, খাজনা এবং কর আদায় করেও জমিদাররা খুশি হত না ; প্রয়োজন হলে বে-আইনি ভাবেও তারা কৃষকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে নিত। মধ্যযুগের সাহিত্যে কৃষকদের করুণ জীবনের অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়।

জমিদার ও চার্চের কর—সামন্তপ্রথার নিয়ম অনুযায়ী জমিদার কৃষকদের কাছ থেকে যত খুশি কর আদায় করতে পারত। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় রীতি-নীতি মেনেই জমিদার কৃষকদের উপর কর বসাতেন। কৃষকরা এই কর নগদ অর্থে অথবা অন্য কোন উপায়ে পরিশোধ করতে পারত। তবে কৃষকদের কাছ থেকে ভালো কাজ পাওয়ার জন্যই অনেক জমিদার বেশি কর আদায় করা পছন্দ করতেন না। চার্চও বেশি কর আদায় না করার জন্য জমিদারদের সতর্ক করে দিত। সব কৃষককেই জমিদারকে বার্ষিক খাজনা দিতে হত। বার্ষিক খাজনার পরিমাণ খুব বেশি ছিল না। সাধারণত কৃষকদের কয়েক পেন্স বা কিছু মাখন অথবা অল্প কিছু মোম খাজনা বাবদ প্রতি বছর জমিদারকে দিতে হত। তবে এই খাজনাকে দাসত্বের চিহ্ন মনে করা হত বলে প্রত্যেকেই তা খুব অপছন্দ করত। প্রত্যেক কৃষককে মাথা-পিছু প্রতি বছর 'ট্যালেজ' নামে আর-একটি কর দিতে হত। এই করই পরে সম্পত্তি-করে পরিণত হয়। তখন সম্পত্তির পরিমাণ অনুযায়ী প্রত্যেককে কর দিতে হত। পুল, রাস্তা প্রভৃতির জন্যও জমিদার কর পেতেন। তাছাড়া সামন্তপ্রথার নিয়ম অনুযায়ী জমিদার জিনিসপত্রের মাধ্যমে অনেক কর আদায় করতেন। বড়দিন ও ঈস্টার উৎসবের সময় কৃষকরা জমিদারদের কিছু কর দিতে বাধ্য থাকত। তাছাড়া কোন কৃষকের মৃত্যুর পর তার ছেলে যখন সম্পত্তির মালিক হত তখনও তাকে কিছু কর দিতে হত। তবে সাধারণত কোন আসবাবপত্র অথবা গৃহপালিত কোন পশু বা প্রাণী

দিয়েই এইসব কর শোধ করা হত। পশুচারণের ক্ষেত্র, বন ও পতিত জমি ব্যবহার করার জন্যও কৃষকদের কর দিতে হত।

জমিদারদের কর ছাড়াও কৃষকদের চার্চে ধর্মকর জমা দিতে হত। তবে পুরোপুরি ধর্ম কর জমা দেওয়া হয়নি, এই অজুহাতে চার্চের লোকেরা কৃষকদের কাছ থেকে বেছে বেছে ভালো দেখে গৃহপালিত পশু ও প্রাণী আদায় করত। জমিদার ও চার্চের এ ধরনের আদায়ের ফলে কৃষকদের আস্তাবল প্রায় পশু ও প্রাণী-শূন্য হয়ে পড়ত।

৯ম পাঠ—দুর্গের জীবনযাত্রা—সমাজের শ্রেণীবিভাগ ঃ

দুর্গই ছিল সামন্তদের বাসস্থান, জমিদারির শাসনকার্যের প্রধান কেন্দ্র, বিচারসভা, খাজাঞ্চিখানা এবং গুরুত্বপূর্ণ আগন্তুকদের সঙ্গে দেখা করার স্থান। সাধারণত দুর্গে একজন সামন্ত সপরিবারে বাস করত। সামন্তের পরামর্শদাতারা, দেহরক্ষী, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, খানসামা প্রভৃতি দুর্গেই বাস করত। খামারবাড়ির প্রধান শাসনকেন্দ্রও দুর্গেই থাকত। সামন্তের স্ত্রী-ও শাসনের কাজে দক্ষতা অর্জন করে সামন্তকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। প্রয়োজন দেখা দিলে দুর্গরক্ষার জন্য সামন্তের স্ত্রী-ও যুদ্ধে যোগ দিতেন। তবে সাধারণত দুর্গের পারিবারিক ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য রাখাই ছিল তাঁর প্রধান কর্তব্য।

দুর্গে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সঞ্চয় করা হত। এখানে বাঁধাকপি, শালগম, গাজর, পেঁয়াজ, শিম, কড়াইশুঁটি প্রভৃতি সবজিও প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকত। ফলের মধ্যে আপেল ও নাশপাতিই ছিল প্রধান। মাছ, মাংস ও দুধ প্রচুর থাকত। তবে পনির তৈরির জন্যই দুধ বেশি ব্যবহার করা হত। চা ও কফির কোন প্রচলন না থাকলেও পানীয় হিসেবে মদ খুব জনপ্রিয় ছিল। ইয়োরোপের লোকেরা তখনও চিনির ব্যবহার জানত না। চিনির বদলে ফলের রস ও মধু-র ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

দুর্গের লোকেরা সাধারণত বিশ্রাম করার কোন সুযোগ পেত না। বিশেষত মেয়েদের কাজের কোন শেষ ছিল না। সারা বছরই নানা ধরনের অতিথি দুর্গে এসে উপস্থিত হত। অনেক সময় গভীর রাত্রি পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া চলত। খাওয়া-দাওয়ার দিকে দুর্গের

লোকজনদের খুব ঝোঁক ছিল। আলোর জন্য সাধারণত মোম ব্যবহার করা হত। জমিদারশ্রেণীর লোকের মধ্যে পাশাখেলা ও পশু-শিকার খুব জনপ্রিয় ছিল। তবে সব জমিদারই খাওয়া-দাওয়া, পাশাখেলা ও পশু-শিকার নিয়ে সারাদিন মেতে থাকতেন না, অনেকেই সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন।

সমাজের তিনটি শ্রেণী—মধ্যযুগের সমাজে তিনটি পৃথক পৃথক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। সমাজের প্রত্যেক শ্রেণী তাদের নির্দিষ্ট কাজ করতে বাধ্য হত। যাজকদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল সমাজের প্রথম শ্রেণী। ধর্মীয় অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই ছিল তাদের কাজ। সামন্ত বা অভিজাতদের নিয়ে গড়ে ওঠে সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণী। দেশ-শাসন ছিল তাদের প্রধান কাজ। যাজক ও অভিজাত ছাড়া বাকি সবাই ছিল তৃতীয় শ্রেণীতে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা যাতে ভালোভাবে তাদের কাজ করতে পারে সেজন্য কঠোর পরিশ্রম করাই ছিল তৃতীয় শ্রেণীর লোকের একমাত্র কর্তব্য। যাজকদের অনেকেই জমিদার ছিল, সুতরাং সামন্তপ্রথার নিয়ম অনুযায়ীই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠত। মধ্যযুগে দেশের শাসন ও ধর্ম, অর্থনীতি ও সামাজিক ব্যবস্থা—সবই সামন্তপ্রথার উপর নির্ভর করত। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অভাবে স্বেচ্ছাচারী জমিদারদের অত্যাচার বন্ধ করা অনেক সময় সম্ভব ছিল না। তবু সাধারণভাবে বলতে গেলে সামন্তপ্রথা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইয়োরোপে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং প্রয়োজনমতো দেশের অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে।

১০ম পাঠ—ভূমিদাস—ভূমিদাস জমিদারদের অস্থাবর সম্পত্তি—পলায়ন—বিদ্রোহ ঃ

সামন্তপ্রথার নিয়ম অনুযায়ী ভূমিদাস ও ক্রীতদাসের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। আইন অনুসারে ভূমিদাস জমিদারের অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হত। তাদের মনে করা হত যেন গৃহপালিত প্রাণী। আইন অনুযায়ী ভূমিদাসরা কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারত না। বাজারে তাদের বেচা-কেনা করাও চলত মোটামুটিভাবে একটা ভালো ঘোড়া আর একজন ভূমিদাসের দাম

একই ছিল। তবে প্রয়োজন হলে একজন ভূমিদাস আর-একজন ভূমিদাসের বিরুদ্ধে বিচারসভায় মামলা করতে পারত। কিন্তু সে কখনও একজন স্বাধীন মানুষ বা একজন জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারত না। স্বাধীনভাবে কিছু করারও তার কোন ক্ষমতা ছিল না। ভূমিদাস এক খামার ছেড়ে অন্য খামারে বা শহরে পালিয়ে যেতে পারত না। পালিয়ে-যাওয়া ভূমিদাসকে ধরে আনার অধিকার জমিদারের ছিল। যে-জমি সে চাষ করত তার সঙ্গে ভূমিদাসের জীবনও চিরকালের জন্য জড়িয়ে পড়ত। খামার বা জমি বিক্রি হলে জমির সঙ্গে ভূমিদাসও বিক্রি হয়ে যেত। বিয়ে করার ব্যাপারেও তাদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। জমিদারের অনুমতি পেলে তারা বিয়ে করতে পারত। বিয়ে করার জন্য তাকে আবার জমিদারকে কর দিতে হত। ভূমিদাসদের সন্তানদেরও জমিদারদের অস্থাবর সম্পত্তি বলে গণ্য করা হত। জমিদারের অনুমতি না পেলে কোন ভূমিদাস তার ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য স্কুলে বা চার্চে পাঠাতে পারত না। চার্চে বা স্কুলে পাঠাবার অনুমতির জন্য ভূমিদাসদের কাছ থেকে জমিদার কর নিত।

জমিদারের জমিতে ও বাড়িতে কাজ করা এবং গৃহপালিত পশু-প্রাণীর দেখাশোনা করা সবই ছিল ভূমিদাসদের দায়িত্ব। প্রতি-সপ্তাহে কমপক্ষে তিনদিন ভূমিদাসদের জমিদারের জমিতে কাজ করতে হত। বীজবোনা ও ফসল কাটার সময় প্রয়োজন হলে আরও বেশি সময় তারা জমিদারের কাজ করতে বাধ্য হত। ভূমিদাসের স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েরা জমিদারের জমিতে ও বাড়িতে কাজ করতে বাধ্য ছিল।

ভূমিদাস-প্রথা বংশানুক্রমিক ছিল। ভূমিদাসের ছেলে ভূমিদাসই হত। ভূমিদাস কোন স্বাধীন মেয়েকে বিয়ে করলেও তাদের সন্তানরা ভূমিদাস হত। তবে কোন কোন জায়গায় স্থানীয় রীতি অনুযায়ী স্বাধীন মেয়ের সঙ্গে বিয়ের ফলে স্বামীর সামাজিক পদমর্যাদার পরিবর্তন হত এবং সে স্বাধীন সমাজে স্থান পেত।

দাসত্ব থেকে পলায়ন ও বিদ্রোহ—কয়েকটি উপায়ে ভূমিদাসরা তাদের এই দাসত্বের যন্ত্রণাময় জীবন থেকে মুক্তি পেতে পারত। জমিদারের অনুমতি নিয়ে যে-কোন ভূমিদাস সন্ন্যাসী হিসেবে চার্চে

যোগ দিতে পারত। অনেক ভূমিদাসই দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার এই সহজ পথটি বেছে নিত। তবে প্রচলিত আইন ভেঙ্গে অন্য দু-ভাবেও অনেকে জোর করেই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারত। প্রথমত, শহরে পালিয়ে গিয়ে কোন কলকারখানা বা বাণিজ্য-কেন্দ্রে চাকরি যোগাড় করে নিত। শহরে একবার পৌঁছুতে পারলে নিরাপদ জীবন ও স্বাধীনতার সুযোগ সে পেত। অথবা যেসব খামারে ভূমিদাসরা ভালো ব্যবহার পায় সেখানেও পালিয়ে গিয়ে সে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান পেত। দ্বিতীয়ত, এই অসহনীয় অবস্থা থেকে বাঁচবার জন্য ভূমিদাসরা জমিদারের বিরুদ্ধে মাঝেমাঝে বিদ্রোহ করত অথবা বিদ্রোহ করার ভয় দেখাত। প্রথম প্রথম জমিদাররা অত্যন্ত কঠোরভাবে এইসব বিদ্রোহ দমন করে। কিন্তু তাতে কোন সুফল হয় না। ভূমিদাসরা সবাই একসঙ্গে বিদ্রোহী হয়ে খামার ছেড়ে যেতে শুরু করে। তখন জমিদাররা ভূমিদাসদের স্বাধীনতার দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে সমস্ত ভূমিদাসই স্বাধীনতা লাভ করে।

মনে রাখবে

১. শার্লামেনের মৃত্যুর পর কয়েক শ বছর ধরে পশ্চিম-ইয়োরোপে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলতে থাকে। অরাজকতার এই যুগে সামন্তপ্রথার সৃষ্টি হয়। রাজা জমির বিলি-বন্দোবস্ত করতেন জমিদারদের সঙ্গে, জমিদারেরা তালুক-দারের সঙ্গে এবং তালুকদারেরা ছোট ছোট মালিকদের সঙ্গে। উপরিওয়ালার প্রয়োজনে প্রত্যেককেই নির্দিষ্ট পরিমাণ সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে হত। জমিদারদের বলা হত সামন্ত। রাজার অনুগত থেকে তাঁরাই আসলে রাজার ক্ষমতা ভোগ করতেন।

২. ক্রমে নতুন নতুন আইন তৈরি হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে বহু পরি-বর্তনের মধ্য দিয়ে সামন্তপ্রথা গড়ে ওঠে, এবং মধ্যযুগের অন্যতম শক্তিশালী সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়।

৩. সামন্তদের সমাজ প্রকৃতপক্ষে যোদ্ধার সমাজ। মধ্যযুগে ইয়োরোপের শান্তিরক্ষায় সামন্ত-প্রভুদের দুর্গগুলির গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। খাদ্যসামগ্রী, অস্ত্র-শস্ত্র, যুদ্ধের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম দুর্গে মজুত রাখা হত। সমাজে বীর যোদ্ধাদের খুব সম্মান ছিল।

৪. সামন্তেরা অনেকেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। দক্ষিণ-ফ্রান্সের সামন্তদের দরবারে এক ধরনের গীতিকবির খুব সমাদর ছিল। এদের বলা হত 'ত্রুব্যাদুর'।

৫. সামন্তপ্রথার রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রধান কেন্দ্র ছিল জমিদারদের খামারবাড়ি। সাধারণত একটি গ্রামকে কেন্দ্র করেই এই খামারবাড়িগুলো গড়ে উঠত। গ্রামের সবাইকেই জমিদারদের জমিতে চাষ করতে হত। সামন্ত-প্রথার বনিয়াদ—জমিদারদের আর্থিক স্বাচ্ছল্য। বড় বড় জমিদারদের একাধিক খামারবাড়ি থাকত। প্রত্যেক খামারের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা ছিল।

৬. মধ্যযুগে ইয়োরোপের কৃষকদের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। তাদের সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হত। আইন অনুসারে ভূমিদাস ছিল জমিদারের অস্থাবর সম্পত্তি—গৃহপালিত প্রাণীর সঙ্গে বা ক্রীতদাসের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য ছিল না। ভূমিদাসপ্রথা ছিল বংশানুক্রমিক। একমাত্র কয়েকটি বিশেষ শর্ত পূরণ করতে পারলেই সেই দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যেত।

অনুশীলনী

১। কি কারণে ইয়োরোপের সামন্তপ্রথা গড়ে ওঠে? সামন্তপ্রথার আইন-কানুনগুলো আলোচনা কর।

২। সামন্তপ্রথা গড়ে ওঠার ফলে যাজকদের জীবনে কি পরিবর্তন দেখা দেয়?

৩। সামন্তযুগে জমিদাররা কি কি অধিকার ভোগ করত?

৪। ইয়োরোপের শান্তিরক্ষার জন্য সামন্তদের দুর্গ ও সশস্ত্র অশ্বারোহীরা কি ভূমিকা পালন করত?

৫। মধ্যযুগের ইয়োরোপের জীবনযাত্রার সঙ্গে সামন্তপ্রথার সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। শিভ্যালরি বা বীরধর্ম কি? শিভ্যালরির নিয়মকানুনগুলো আলোচনা কর।

৭। ক্রব্যাদুর কাদের বলা হত? ক্রব্যাদুরদের সম্পর্কে কি জান?

৮। মধ্যযুগের জমিদারদের খাসজমি ও খামারব্যবস্থা রাজনীতি ও অর্থ-নীতিতে কি ধরনের ভূমিকা পালন করত?

৯। খামারের শাসনব্যবস্থা কেমন ছিল?

১০। খামারের বিচারব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল?

১১। কৃষকদের কি কি কাজ করতে হত?

১২। কৃষকদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল?

১৩। কৃষকদের জমিদার ও চার্চকে কি কর দিতে হত?

১৪। মধ্যযুগে দুর্গের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল ?

১৫। কিভাবে ভূমিদাসরা দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারত ?

১৬। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ
(ক) মধ্যযুগের সমাজে ক-টি শ্রেণী ছিল ? কিভাবে তাদের শ্রেণী-বিভাগ করা হত ? (খ) 'ভূমিদাস ছিল জমিদারদের অস্থাবর সম্পত্তি'—আলোচনা কর। (গ) খামারের জমিগুলো ক-ভাগে ভাগ করা হত ? কোন্ ঋতুতে কি চাষ করা হত ? (ঘ) খামারের যৌথ চাষ প্রথা কিভাবে চলত ?

১৭। এককথায় উত্তর দাও ঃ
(ক) সামন্তযুগে রাজার প্রকৃত ক্ষমতা কে ভোগ করত ? (খ) মধ্যযুগের অর্থনীতির প্রধান বনিয়াদ কি ছিল ? (গ) মধ্যযুগে এক-একজন কৃষকের সাধারণত কত জমি থাকত ? (ঘ) জমিদারদের কর ছাড়া কৃষকদের অন্য আর কি কর দিতে হত ? (ঙ) মধ্যযুগে লোকেরা চিনির বদলে কি ব্যবহার করত ?

১৮। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—
(ক) মধ্যযুগে সমাজে — পৃথক পৃথক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। (খ) ভূমিদাস প্রথা — ছিল। (গ) দুর্গে আলোর জন্য সাধারণত — ব্যবহার। (ঘ) একাদশ শতাব্দীর ফরাসী দেশের গীতিকাব্য-রচয়িতা কবিরা — নামে পরিচিত। (ঙ) মধ্যযুগে নাইট বা বীরদের বীরধর্ম ও রীতি-নীতিকে — বলে।

অষ্টম অধ্যায়

ধর্মযুদ্ধ (প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ)

১ম পাঠ—ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশ্য ঃ

ইসলাম ধর্মের উত্থান ও মুসলমানদের শক্তিবৃদ্ধির পর থেকেই পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যে নূতন সংকট দেখা দেয়। প্রথম দিকে তারা মুসলমানদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয় এবং মুসলমানদের হাত থেকে ইয়োরোপের জনসাধারণের স্বাধীনতা, ধর্ম ও সভ্যতা রক্ষা করে। কিন্তু ধীরে ধীরে পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি অত্যন্ত

দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাদের দুর্বলতার সুযোগে মুসলমানরা বাইজ্যান্টিয়ান সাম্রাজ্য অধিকার করার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে।

তখন বাগদাদ শাসন করত সেলজুক তুর্কীরা। ১০৭১ খ্রীষ্টাব্দে তারা বাইজ্যান্টিয়ামের সম্রাট রোমুলাসকে ম্যানজিকার্টের যুদ্ধে পরাজিত করে। ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের উপর তুর্কীদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। ফলে খ্রীষ্টানদের পবিত্রস্থান জেরুজালেমও মুসলমানদের অধিকারে চলে যায় এবং বাইজ্যান্টিয়ান সাম্রাজ্যের পতনও অনিবার্য হয়ে পড়ে। রোমুলাসের পর কনস্ট্যান্টিনোপলের সিংহাসনে বসেন প্রথম আলেক্সিস। সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যের অধিবাসী-দের খ্রীষ্টধর্ম রক্ষার জন্য তিনি রোমের পোপ দ্বিতীয় আরবানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। পোপ তখন জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য পশ্চিম-ইয়োরোপের খ্রীষ্টানদের কাছে আবেদন জানান। পোপের আবেদনের ফলে সমস্ত শ্রেণীর খ্রীষ্টানদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব ধর্মীয় উন্মাদনা দেখা দেয়। একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্ব থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিম-ইয়োরোপের বহু যোদ্ধা ও অন্যান্য লোক তুর্কীদের হাত থেকে খ্রীষ্টানদের পবিত্রস্থান উদ্ধার করার চেষ্টা করে। ইতিহাসে এই ঘটনা 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধ নামে পরিচিত। রাজা, রাজপুত্র, বিশপ, অভিজাত সম্প্রদায়, নাইট বা বীর যোদ্ধা, ধনী, নির্ধন, বৃদ্ধ, শিশু, বালক, নারী প্রভৃতি সকলেই এই ধর্মযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য কনস্ট্যান্টিনোপলের দিকে যাত্রা করে।

নিঃসন্দেহে একথা বলা যেতে পারে যে ধর্মযুদ্ধে যোগদান-কারীদের অধিকাংশই ধর্মরক্ষার উৎসাহেই এই অভিযানে যুক্ত হয়। তবে অনেকে দুঃসাহসিক কাজে অভিজ্ঞতা-অর্জন ও লুটপাটের আশায় এবং অনেকে শাস্তি ও দাসত্বের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যও এই যুদ্ধে যোগ দিত। অনেকের আবার অন্যরকম উদ্দেশ্য ছিল। সিরিয়ার উর্বর জমির উপর জমিদারদের লোভ ছিল। বাণিজ্যের নূতন সম্ভাবনার কথাও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মনে ছিল। ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়ে দুর্বৃত্তরা বিচার ও শাস্তির হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পথ খুঁজে পেল। এই অভিযানে যোগ দিয়ে ঋণ পরিশোধ না করার সুযোগ পেয়ে গেল আর-একদল লোক। তবে অনেক সাধারণ

লোক এবং দুঃসাহসী ব্যক্তি নিছক শখ করেই ধর্মযুদ্ধে যোগ দিতে এগিয়ে আসে।

প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ—প্রথম ধর্মযুদ্ধের সৈন্যবাহিনী ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইয়োরোপ থেকে যাত্রা করে এবং ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জেরুজালেম অধিকার করে। ধর্মযুদ্ধগুলোর মধ্যে প্রথম অভিযানই সবচেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করে। জেরুজালেম অধিকার করার পর সেখানে তারা একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করে। ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই রাজ্যের স্বাধীনতা অটুট থাকে। তাছাড়া অ্যান্টিয়োক, এডেসা ও ত্রিপোলি তাদের অধিকারে আসে।

১১৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১১৪৯ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান শাসনকর্তা সালাদিন আবার খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে জেরুজালেম অধিকার করে। ফলে তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়। জার্মানির ফ্রেডারিক বারবারোসা, ইংলণ্ডের রিচার্ড এবং ফ্রান্সের ফিলিপ অগাস্টাস—ইয়োরোপের এই তিন শক্তিশালী রাজা এই যুদ্ধে যোগ দেন। তবে তাঁদের নিজেদের মধ্যে একতা না থাকায় এই অভিযান ব্যর্থ হয়।

চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়। এই অভিযানের বিভিন্ন ঘটনা দেখলে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে ধর্মযুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ভেনিসের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উদ্যোগে এই অভিযান পাঠানো হয়। ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে তারা কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার করে। তারা সেণ্ট সোফিয়ার পবিত্র বেদী ধ্বংস করে শহরে নৃশংসভাবে লুটপাট চালায়।

২য় পাঠ—ইয়োরোপের সমাজ ও সভ্যতার উপর ধর্মযুদ্ধের প্রভাব : ধর্মযুদ্ধের ফলে পোপের সম্মান সামান্যভাবে বেড়ে গেলেও ধর্মযুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য একেবারেই ব্যর্থ হয়। তুর্কীদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ইসলাম ধর্মের অগ্রগতিও বন্ধ করা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় ব্যাপারে ধর্মযুদ্ধের ফলাফল একেবারে গুরুত্বহীন। কিন্তু ইয়োরোপের সমাজ ও সভ্যতার উপর ধর্মযুদ্ধ গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মযুদ্ধ পশ্চিম-ইয়োরোপের সমাজজীবনে বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। সামন্তপ্রথার আইনকানুন অনেক শিথিল হয়। ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়ে অনেক ভূমিদাস দাসত্ব

থেকে মুক্তিলাভ করে। শহর গড়ে ওঠা ও শিল্পের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভূমিদাস খামার থেকে পালিয়ে গিয়ে নূতন আশ্রয় এবং নূতন জীবিকার সন্ধান পায়। এই যুগ থেকেই পশ্চিম ইয়োরোপের নারীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ধর্মযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য জমিদাররা দীর্ঘদিনের জন্য বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয় এবং তাদের স্ত্রীরা-ই জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সুষ্ঠু-ভাবে এই দায়িত্ব পালন করার ফলে সমাজে তারা খুব সম্মানের স্থান অধিকার করে।

ধর্মযুদ্ধের ফলে পশ্চিম-ইয়োরোপের লোকদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায়ও অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। গ্রীক এবং মুসলমানদের অনেক রীতি-নীতি তারা গ্রহণ করে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদেও প্রাচ্যদেশের প্রভাব পড়ে। প্রাচ্যদেশের খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য জিনিস-পত্র তারা পছন্দ করতে শুরু করে।

ধর্মযুদ্ধের সময় ইয়োরোপে নূতন নূতন শহর গড়ে ওঠে। শহরের অধিবাসীদের ক্ষমতাবৃদ্ধি ও অনেক ভূমিদাসের স্বাধীনতালাভের ফলে অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তন দেখা দেয়। ইয়োরোপের খামারের উপর নির্ভরশীল সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতি ধীরে ধীরে নগরকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। সামন্ত ও জমিদারদের জায়গায় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং কলকারখানার মালিকরা বেশি সম্মান ও প্রতিপত্তি পেতে থাকে। দেশের শাসকরাও শহরের গুরুত্ব স্বীকার করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রভাব মেনে নিতে বাধ্য হয়। দেশের শাসনব্যবস্থায়ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রভাব বাড়তে থাকে।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাইরের জগতের সঙ্গে ইয়োরোপের কোন সম্পর্ক ছিল না। ফলে পশ্চিম-ইয়োরোপের সভ্যতার উন্নতির পথও একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ধর্মযুদ্ধের সময় বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তাদের সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে। আরবীয়দের কাছ থেকে তারা সংখ্যার ব্যবহার, বীজগণিত ও নাবিকদের কম্পাসের ব্যবহার জানার সুযোগ পায়। গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন জানার জন্য তাদের আবার উৎসাহ জেগে ওঠে। অ্যারিস্টটলের রচনার সঙ্গেও তাদের আবার নূতন করে পরিচয় ঘটে। মুসলমানদের উন্নত ধরনের

চিকিৎসা-বিজ্ঞানও তারা শিখতে চেষ্টা করে। এই সময়ই ইয়োরোপের লোকেরা প্রথম উইণ্ডমিল দেখার সুযোগ পায়।

ধর্মযুদ্ধের সময় থেকেই পশ্চিম-ইয়োরোপের যুদ্ধ-কৌশলে পরিবর্তন দেখা দেয়। দুর্গে ব্যবহারের জন্য লোহার দরজা, নতুন ধরনের ধনুক, অশ্ব ও অশ্বারোহী যোদ্ধার জন্য ভারী বর্ম, গ্রীকদের আগ্নেয়াস্ত্র, এবং সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য পায়রার ব্যবহার এই সময়ই ইয়োরোপে প্রচলিত হয়।

ধর্মযুদ্ধের ফলে ইয়োরোপের লোকের ভৌগোলিক জ্ঞান অনেক বেড়ে যায়। প্রায় দু-শ বছর ধরে ইয়োরোপের পশ্চিম প্রান্ত থেকে হাজার হাজার হাজার লোক কনস্ট্যান্টিনোপলে যাতায়াত করে। ফলে বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, নদনদী, পাহাড়-পর্বত, রাস্তাঘাট, শহর-বন্দর, হাট-বাজার সম্পর্কে তারা সব-কিছু জানার সুযোগ পায়। ভূমধ্যসাগরের মানচিত্র, তীর্থযাত্রীদের ভ্রমণের সুবিধার জন্য অনেক বই এবং মোঙ্গল রাজদরবারের বিবরণ এই সময় প্রকাশিত হয়। অনেক পর্যটক বিভিন্ন দেশের নানা স্থানে ঘুরে বেড়ান এবং নানারকম অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এইসব পর্যটকদের মধ্যে মার্কো পোলোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন দেশ ও নানা জাতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ইয়োরোপের জনসাধারণের সংকীর্ণতা অনেক কমে যায়। জেরুজালেম থেকে ফিরে এসে অনেকেই মাতৃভাষায় ধর্মযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে শুরু করে। ফলে আঞ্চলিক ভাষারও যথেষ্ট উন্নতি হয়। প্রাচ্যের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য রীতিও পশ্চিম-ইয়োরোপের শিল্পের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

৩য় পাঠ—নুতন শহর ও বাণিজ্য-কেন্দ্র, কুটিরশিল্প :

ধর্মযুদ্ধের ফলে ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠে এবং ইয়োরোপের বাণিজ্যেও বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। ধর্মযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য দেশের রাজাদের অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অর্থের বিনিময়ে তখন তারা নতুন নতুন শহরের স্বায়ত্ত-শাসনের সনদ দিতে রাজি হয়। এভাবে বিভিন্ন দেশে অনেক নতুন শহর গড়ে ওঠে। চার্চের প্রতিপত্তি কমানোর উদ্দেশ্যেও রাজারা অনেক সময় নতুন শহর গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। ফ্রান্সের

নর্ম্যাণ্ডি ও লয়্যারের—এসব শহরই ধর্মযুদ্ধের সময় গড়ে ওঠে। ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস কমপক্ষে সতেরটি শহরের নতুন সনদ মঞ্জুর করেন। ধর্মযুদ্ধের সময় সৈন্য-চলাচলের সুবিধার জন্যও কয়েকটি নতুন শহরের পত্তন হয়। এইসব শহরের মধ্যে আইগুয়েস ও মোর্তেসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। সৈন্যদের চলাচলের সুবিধার জন্য ফ্রান্সের রাজা নবম লুই ভূমধ্যসাগরের তীরে এই শহর দুটি গড়ে তোলেন। ধর্মযুদ্ধের সময়েই হামবুর্গ, ব্রিমেন, লিউব্রেক, অ্যানটোয়ার্প, বার্জেস, ঘেণ্ট প্রভৃতি স্থান বাণিজ্য-কেন্দ্র ও শহরে পরিণত হয়। ধর্মযুদ্ধের সময় ইয়োরোপের পুরনো শহর-গুলোও আবার নতুন করে গুরুত্ব লাভ করে।

ধর্মযুদ্ধের সময় ইয়োরোপের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ইটালির শহরগুলোতেই পরিবর্তন আসে। একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকেই ভেনিস অ্যাড্রিয়াটিক সমুদ্র থেকে শ্লাভ জলদস্যুদের তাড়িয়ে দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে ভেনিস কিছুদিনের মধ্যেই তার অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি নিরাপদ করে তোলে। ইটালির আর দুটি বড় বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল জেনোয়া ও পিসা। ধর্মযুদ্ধের ফলে ভেনিস, জেনোয়া ও পিসা ভূমধ্যসাগর ও ঈজীয় সাগরের উপর পুরোপুরি কর্তৃত্ব স্থাপন করে। কৃষ্ণসাগরের পথে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও কনস্ট্যান্টিনোপলের সঙ্গেও তাদের বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উত্তর-আফ্রিকার বিভিন্ন বন্দরের সঙ্গেও তাদের বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পশ্চিম-ইয়োরোপের নর্ম্যাণ্ডি, ইংল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশেও নতুন নতুন বাণিজ্য-কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ফ্লাণ্ডার্স, ভেনিস, জেনোয়া, পিসা প্রভৃতি বড় বড় বাণিজ্য-কেন্দ্র থেকে ইয়োরোপের সর্বত্র পণ্যদ্রব্য ছড়িয়ে পড়ত। উত্তরসাগর, কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলোই একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইয়োরোপের বাণিজ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করে।

কৃষি ও কুটিরশিল্প—মধ্যযুগের প্রথমদিকে ইয়োরোপের অর্থনীতি পুরোপুরিভাবে জমির উপর নির্ভরশীল ছিল। খামারের বাসিন্দারা নিজেদের প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্রই নিজেরা তৈরি করে নিত। কিন্তু ধীরে ধীরে কৃষির উপর নির্ভরশীল অর্থনীতিতে পরিবর্তন দেখা

দেয়। বিভিন্ন অঞ্চলে শহর গড়ে ওঠার ফলে অর্থনীতির কাঠামোই সম্পূর্ণভাবে পাল্টে যায়। শহরের লোকেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য নূতন নূতন কুটিরশিল্প গড়ে উঠতে শুরু করে। এইসব শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শুধু কুটিরশিল্পের উপর নির্ভর করেই একদল লোক তাদের জীবিকা অর্জন করতে থাকে। এইসব শিল্পের কারিগরদের জীবিকার জন্য আর কৃষির উপর নির্ভর করতে হত না। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই কুটিরশিল্প কৃষি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়।

মনে রাখবে

১. ইসলাম ধর্মের শক্তিবৃদ্ধির ফলে একসময়ে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন তুর্কী-মুসলমানদের অধীনে আসে এবং খ্রীষ্টানদের পবিত্র স্থান জেরুজালেম খ্রীষ্টানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। পশ্চিম-ইয়োরোপের বহু যোদ্ধা ও সাধারণ মানুষ তুর্কীদের কাছ থেকে জেরুজালেম উদ্ধারের চেষ্টা করে। এই ঘটনাকে ইতিহাসে 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধ বলা হয়েছে।

২. প্রথম ধর্মযুদ্ধে (১০৯৯ খ্রী) খ্রীষ্টানেরা জয়লাভ করে জেরুজালেম উদ্ধার করে। ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানেরা আবার জেরুজালেম অধিকার করে। ফলে তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ ঘটে, কিন্তু এ অভিযান ব্যর্থ হয়। এরপর চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ। এই যুদ্ধে আংশিক সাফল্য ঘটে—কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকারে আসে, কিন্তু জেরুজালেম উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ইসলাম ধর্মের অগ্রগতি বন্ধ করা যায়নি।

৩. ধর্মযুদ্ধ পশ্চিম ইয়োরোপের সমাজজীবনে বিপুল পরিবর্তন এনে দেয়। সামন্তপ্রথার আইনকানুন অনেক শিথিল হয়। ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারী ভূমি-দাসেরা দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়।

৪. অর্থনীতিতেও পরিবর্তন ঘটে। সামন্ত-জমিদারের তুলনায় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং কলকারখানার মালিকদের হাতে অর্থসম্পদ বেশি জমা হতে থাকে এবং দেশের শাসন-ব্যবস্থায় এই শ্রেণীর লোকদের প্রতিপত্তি বেড়ে যায়।

৫. ধর্মযুদ্ধের জন্য অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় রাজারা অর্থের বিনিময়ে নূতন নূতন শহর গড়ে তোলার অনুমতি দেন। সৈন্যদের চলাচলের সুবিধার জন্যও নূতন শহরের পত্তন হয়। এভাবে দেশের অর্থনীতি নগরকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে।

৬. আগে দেশের অর্থনীতি ছিল পুরোপুরি কৃষিনির্ভর। এখন শহরের লোকদের প্রয়োজন মেটাতে নূতন নূতন কুটিরশিল্প গড়ে উঠতে থাকে এবং

এইসব শিল্পজাত জিনিসের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় কুটিরশিল্প কৃষি থেকে আলাদা এবং স্বাধীন জীবিকার উপায় হয়ে ওঠে।

অনুশীলনী

১। ধর্মযুদ্ধ কি? ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশ্য কি ছিল? ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের এই যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

৩। ইয়োরোপের সমাজ ও সভ্যতার উপর ধর্মযুদ্ধ কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে?

৪। ধর্মযুদ্ধের ফলে কিভাবে নূতন নূতন শহর ও বাণিজ্য-কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়?

৫। ধর্মযুদ্ধের পরবর্তীকালে কিভাবে কৃষি ও শিল্প আলাদা ভাবে গড়ে উঠতে থাকে?

৬। এক কথায় উত্তর দাও:

(ক) কোন্ যুদ্ধে বাইজ্যান্টিয়ামের শাসনকর্তা বাগদাদের শাসনকর্তার কাছে পরাজিত হয়? (খ) কোন্ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের উপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়? (গ) খ্রীষ্টানদের পবিত্র-স্থানের নাম কি? (ঘ) কোন্ বছর তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়? (ঙ) ফ্রেডারিক বারবারোসা, রিচার্ড ও ফিলিপ অগাস্টাস্ কোন্ ধর্মযুদ্ধে যোগ দেন?

৭। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:

(ক) রোমুলাসের পর কনস্ট্যান্টিনোপলের সিংহাসনে বসেন —। (খ) — — শেষ পর্ব থেকে — — পর্যন্ত পশ্চিম-ইয়োরোপের বহু যোদ্ধা ও অন্যান্য লোক — হাত থেকে খ্রীষ্টানদের পবিত্র স্থান উদ্ধার করার চেষ্টা করে। ইতিহাসে এই — বা — নামে পরিচিত। (গ) —খ্রীষ্টাব্দ থেকে — খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। (ঘ) ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অনেক — দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে। (ঙ) এইসব পর্যটকদের মধ্যে — নাম বিশেষভাবে —। (চ) — খ্রীষ্টাব্দে ইয়োরোপের সৈন্যরা — অধিকার করে। (ছ) আরবের লোকদের কাছ থেকে তারা — ; — ও নাবিকদের — সুযোগ পায়। (জ) ধর্মযুদ্ধের ফলে প্রাচ্যের — ও — রীতি ও পশ্চিম ইয়োরোপের — উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

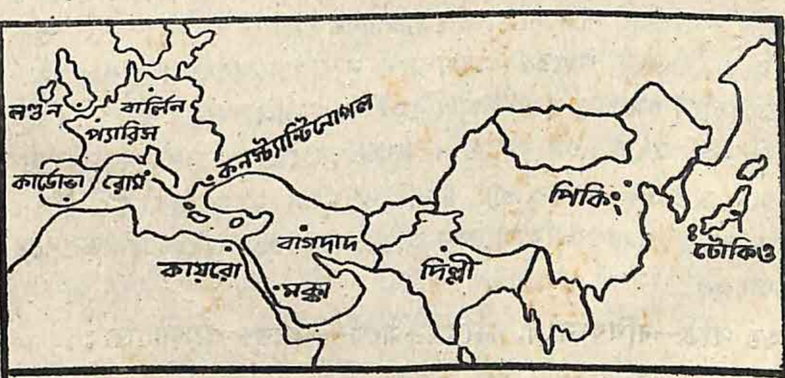
৮। নিম্নলিখিত শহরগুলো কোন্ দেশে অবস্থিত ?
(ক) ভেনিস ; (খ) জেনোয়া ; (গ) পিসা ; (ঘ) অ্যানটোয়ার্প ; (ঙ) হামবুর্গ ; (চ) লিউবেক ; (ছ) ফ্লাণ্ডার্স ; (জ) ব্রিমেন।

নবম অধ্যায়

শহরের উৎপত্তি

১ম পাঠ—শহরের উন্নতি—উন্নতিতে ধর্মযুদ্ধের দান :

একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে রোমান আমলের পুরনো শহরে অথবা একেবারে নূতন জায়গায় বহু লোকজন বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। কিছুদিনের মধ্যে এইসব জায়গায় শহর গড়ে ওঠে। অনেক সময় বিশপদের চার্চ, সামন্তদের দুর্গ অথবা সন্ন্যাসীদের মঠকে কেন্দ্র করে নূতন শহর গড়ে উঠতে থাকে। কোন কোন সামরিক ঘাঁটি অথবা বাণিজ্য-



মধ্যযুগের শহর

বন্দরকে কেন্দ্র করেও শহরের পত্তন হয়। যোগাযোগের সুবিধার জন্য শহরগুলি সাধারণত নদীর তীরে অথবা গুরুত্বপূর্ণ রাজপথের পাশে গড়ে উঠত। কৃষি-সমৃদ্ধ অঞ্চলেও কখনও কখনও শহরের সৃষ্টি

হত। লোম্বার্ডির উর্বর অঞ্চলের মিলান, ইল দ্য ফ্রান্সের প্যারিস ও ব্রাবন্তের ব্রুসেল্‌স্‌ প্রভৃতি এইরকম শহর। সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে ইটালির ভেনিস, জেনোয়া, পিসা, আইগুয়েস, মোর্তেস প্রভৃতি শহর। একাদশ শতাব্দীতে ইটালি ছাড়া অন্যান্য দেশের শহরগুলি খুব ছোট ছিল। আয়তনে তারা ছিল বড় গ্রামের মতো। তবে কলোন, মেইন্‌জ, ট্রোয়েস, রিম্‌স্‌, লণ্ডন, ব্রিস্টল, নরউইচ প্রভৃতি শহরের আয়তন তখনও অনেক বড় ছিল।

ধর্মযুদ্ধের সময় রাজা ও জমিদারদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রয়োজনের সময় অর্থ যোগান দিয়ে অনেক সমৃদ্ধ অঞ্চলের অধিবাসীরা স্থানীয় শাসকদের কাছ থেকে শহর গড়ে তোলার অনুমতি লাভ করে—সঙ্গে সঙ্গে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারও। এইভাবে ধর্মযুদ্ধের সময় বিভিন্ন স্থানে বহু নূতন নূতন শহর গড়ে ওঠে। অনেক বাণিজ্য-কেন্দ্রও ধীরে ধীরে শহরের রূপ নেয়। হামবুর্গ, লিউবেক, অ্যানটোয়ার্প, বার্জেস, ঘেণ্ট প্রভৃতি স্থান ধর্মযুদ্ধের সময় বাণিজ্য-কেন্দ্র ও শহরে পরিণত হয়।

প্রথম দিকে অনেক শহরের আয়তনই ছোট ছিল। শহরের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক এসে সেখানে বসবাস করতে শুরু করে। তখন শহরের আশেপাশে নূতন বাড়িঘর তৈরি হতে থাকে। এইভাবে প্রত্যেক শহরের চারদিকেই শহরতলি গড়ে উঠত। কিছু দিনের মধ্যেই এই শহরতলি অঞ্চল শহরের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হয়ে যেত এবং আবার তার চারদিকে নূতন শহরতলির সৃষ্টি হত। এইভাবে শহরগুলোর আয়তন আর লোকসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে।

২য় পাঠ—বণিক-সংঘ, কারিগর-সংঘ—শহরের জীবনযাত্রা ঃ রাজা বা জমিদারের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে অধিকার করা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শহরের লোকেরা অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠে। বাইরের লোকেরা যাতে কোনভাবে এই স্বাধীনতার অংশ ভোগ করতে না পারে অথবা তাদের স্বাধীনতা নষ্ট না করতে পারে, সেদিকে তারা খুব সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলত। নিজেদের স্বাধীনতা ও স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই শহরের লোকেরা 'সংঘ' গঠন করে। শহরের বণিকরাই সাধারণত এই সংঘ গঠন করত। একাদশ ও দ্বাদশ

শতাব্দীতে প্রত্যেক শহরেই একটি করে বণিক-সংঘ ছিল। শহরের সব ব্যবসায়ীই এই সংঘের সদস্য হত। সংঘের নামেই রাজা শহরের জন্য প্রয়োজনীয় সনদ মঞ্জুর করতেন।

ব্যবসা-সংক্রান্ত এবং অন্যান্য কাজের জন্য সংঘের সদস্যরা সাধারণত একটি হলঘরে মিলিত হত। সেখানেই তারা ব্যবসা-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করত এবং নানা রকম ধর্মীয় ও দাতব্য কাজের জন্য চাঁদা তুলত। ব্যবসায়ে একচেটিয়া সুযোগ ভোগ করা, সমস্ত ব্যবসায়ীকে সমান সুযোগ দেওয়া, ক্রেতাদের কাছে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পণ্যদ্রব্য পৌঁছে দেওয়া এবং বিভিন্ন শিল্পের আরও উন্নতি করাই ছিল বণিক-সংঘের উদ্দেশ্য। পণ্যদ্রব্যের উচ্চমান বজায় রাখার জন্য বণিক-সংঘের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান মাঝেমাঝে পরিদর্শন করা হত।

শহরের সমস্ত ক্রয়-বিক্রয় পরিচালনা করা ছাড়াও শহরের শাসনের ব্যাপারেও তারা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করত। শহরের অধিবাসীদের স্বার্থের দিকেও তারা সতর্ক দৃষ্টি রাখত। পণ্যশুল্ক আদায় করা এবং সেতু, প্রাচীর, শহরের ফটক ও নর্দমা তৈরি করার প্রত্যেকটি কাজই তারা দায়িত্ব নিয়ে করত। আবার দলবদ্ধ হয়ে ব্যবসায়ীরা যখন বাইরে কোথাও বাণিজ্য করতে যেত, বণিক-সংঘই তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করত। বিশৃঙ্খল ও শান্তিহীন সমাজজীবনে ভালোভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য পরস্পরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করাই ছিল বণিক-সংঘের প্রধান কর্তব্য।

প্রত্যেক বণিক-সংঘেই তিন শ্রেণীর সদস্য থাকত—মালিক, মজুর বা ঠিকা লোক ও শিক্ষানবিশ। মালিক ও মজুররা সংঘের নির্বাচনে ভোট দিতে পারত। কিন্তু শিক্ষানবিশদের কোন ভোট ছিল না। মধ্যযুগের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকরা পণ্যদ্রব্যের মান উন্নত করার জন্য কতদূর আগ্রহী ছিল, শিক্ষানবিশ নিয়োগের ব্যবস্থা থেকে তা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারা যায়।

কারিগর সংঘ—বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিক বা কারিগররা প্রথম দিকে বণিক-সংঘের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। কিন্তু বণিকদের অর্থ ও প্রতিপত্তি বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা নানাভাবে শ্রমিকদের শোষণ করতে শুরু করে। শ্রমিকদের স্বার্থের দিকে তারা কোনরকম দৃষ্টি দিত

না। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তখন তারা পৃথক সংঘ গঠন করে। তবে সাধারণত উত্তর-ইটালি, রাইনল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতির মতো উন্নত ও বড় বড় শিল্পকেন্দ্রেই এরকম সংঘ গড়ে ওঠে।

শহরের জীবনযাত্রা—মধ্যযুগের শহরগুলির লোকসংখ্যা খুব বেশি ছিল না। বড় বড় শহরে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার লোক বাস করত। তবে শহরের বাজারে সবসময়ই নানা শ্রেণীর লোকেদের ভিড় লেগে থাকত। শহরের লোকেদের জীবনযাত্রাও বিভিন্ন রকমের ছিল। বড় বড় ব্যবসায়ী ও অভিজাত ব্যক্তিরা বিরাট বিরাট বাড়ি তৈরি করাত। তাদের জীবনযাত্রাও ছিল খুব বিলাসবহুল। অন্যান্য লোকেরা শহরের বাইরের দিকে খুব সাধারণ ধরনের বাড়িতে বাস করত। মধ্যযুগে বেশির ভাগ শহরের রাস্তাই কাঁচা ছিল। ইটালির শহরগুলোতেই প্রথম পাকা রাস্তা তৈরি হয়। পরে ফ্রান্স ও জার্মানির শহরগুলোতেও পাকা রাস্তা তৈরি হতে শুরু করে। শহরের নর্দমার ব্যবস্থা ভালো ছিল না। রাস্তার উপরেই সব ময়লা জমা করা হত। ফলে পথচারীদের খুব অসুবিধা হত। প্রাকৃতিক কারণ ছাড়া রাস্তাঘাট পরিষ্কারের কোন ব্যবস্থা ছিল না। জনসাধারণের জন্য কোন স্নানাগার ছিল না। অনেক বাড়িতেও স্নানাগারের ব্যবস্থা থাকত না। শহরে পরিস্রুত জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা ছিল না। জলের জন্য শহরের অধিবাসীদের পাতকুয়োর উপর নির্ভর করতে হত। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও জলের অভাবের জন্য শহরে প্রায়ই কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি রোগ মহামারী আকারে দেখা দিত এবং বহুলোক প্রাণ হারাত। সাধারণ ভাবেই মধ্যযুগে মৃত্যুর হার খুব বেশি ছিল। চার্চ বা মঠ ছাড়া অন্য কোথাও আলোর ব্যবস্থা ছিল না। রাত্রিতে রাস্তায় আলো দেওয়ার কোন নিয়ম ছিল না। ফলে রাত্রিতে শহরে চোর-ডাকাতের খুব উপদ্রব ছিল। চোর-ডাকাতের ভয়ে শহরের লোকেরা সন্ধ্যা হওয়ার আগেই বাড়ির সদর-ফটক বন্ধ করে দিত।

শহরের শাসনভার বড় বড় ব্যবসায়ী ও অভিজাতদের হাতে ছিল। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা সাধারণ লোক ও শ্রমিকদের উপর নানারকম অত্যাচার করত। ফলে শহর গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বড় বড় ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম দেখা

দেয়। ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সে এবং ১৩৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে এবং ঘেণ্টে মালিক-শ্রমিক সংঘর্ষ প্রবল আকার নেয়।

মধ্যযুগে শহরকে কেন্দ্র করেই প্রথম ধনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রথম থেকেই চার্চ এই সমাজব্যবস্থার কঠোর নিন্দা করে। চার্চের এই মনোভাব শহরের বড়লোকদের জীবনযাত্রার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

৩য় পাঠ—রাজকীয় সনদ ও শহরের স্বায়ত্তশাসন—বুর্জোয়া :

শহরের লোকদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি দেশের শাসকরা মোটেই পছন্দ করতে পারেননি। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা ও দ্বিতীয় ফ্রেডারিক লোম্বার্ডি অঞ্চলের বিভিন্ন শহরের স্বায়ত্তশাসনের দাবি কঠোরভাবে দমন করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে চার্চের ক্ষমতা কমানোর উদ্দেশ্যে রাজারা শহরের অধিবাসীদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস কমপক্ষে আটাত্তরটি নূতন শহরের জন্য সনদ দেন। অর্থের বিনিময়ে এবং যুদ্ধের সময় প্রয়োজনীয় সামরিক সাহায্য লাভের আশায় তিনি অনেক শহরের স্বায়ত্তশাসনের দাবি মঞ্জুর করেন। ধর্মযুদ্ধের সময় রাজাদের প্রয়োজনীয় অর্থদান করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বহু শহর স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে। এর ফলে শহরের অধিবাসী এবং রাজাদের মধ্যে একটা নূতন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরবর্তী কালে শহরের শাসনের উপর রাজার প্রভাব বাড়াবার জন্য মেয়র প্রভৃতি কয়েকজন রাজকর্মচারী নিযুক্ত হলেও শহরের অধিবাসীদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার মোটামুটিভাবে রক্ষা করা হয়।

বুর্জোয়া—মধ্যযুগের সব শহরই প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকত। এইসব প্রাচীর ঘেরা শহরকে বার্গ বলা হত। শহরের লোকেরা প্রাচীর-ঘেরা জায়গাতেই বসবাস করত। কিন্তু লোকসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের মধ্যে জায়গার অভাব দেখা দিতে শুরু করে। তখন অনেক ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও নানাধরনের লোক প্রাচীরের বাইরে বাড়িঘর তৈরি করে বসবাস করতে থাকে। শহরতলির এইসব বাসিন্দাকে ফৌবর্গস বলা হত। শহরতলির অধিবাসীরা নিজেদের প্রাণ ও বিষয়-সম্পত্তি নিরাপদ করে তোলার জন্য তাদের বাসস্থান

ঘিরে নূতন প্রাচীর তুলে দিত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই একদল নূতন লোক ঐ নূতন তৈরি-করা প্রাচীরের বাইরে আর-একটি নূতন শহরতলি গড়ে তুলত। আবার এই শহরতলির চারদিকে নূতন প্রাচীর গড়ে উঠত। এইভাবে ধীরে ধীরে পুরনো শহরের চারদিকে নূতন শহরের সৃষ্টি হত। রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার, জীবিকা ও জীবন-যাত্রায় পুরনো বর্গ বা পুরনো শহরের লোকদের সঙ্গে এদের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে এইসব লোকেরা সমাজে আর-একটি নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি করে। এই নূতন শ্রেণীর লোকেরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক বা বুর্জোয়া নামে পরিচিত।

মনে রাখবে

১. ধর্মযুদ্ধের সময়ে নূতন নূতন শহরের পত্তন হয়। রাজা আর জমিদারদের অর্থের দাবি মিটিয়ে অনেক সমৃদ্ধ অঞ্চলের অধিবাসীরাই শহর তৈরির অধিকার লাভ করে। পুরনো অনেক বাণিজ্য-কেন্দ্রও শহরে পরিণত হয়। সৈন্যদের চলাচলের জন্যও শহর গড়ে তোলার প্রয়োজন বোধ করা হয়। এভাবে অনেক শহর গড়ে ওঠে।

২. শহরের ব্যবসায়ীরা রাজা বা জমিদারকে অর্থ দিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করে নেয়। এভাবে শহরে 'সংঘ' গড়ে ওঠে। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রত্যেক শহরেই একটি করে 'বণিক-সংঘ' ছিল। ব্যবসায়ীদের সবরকমের স্বার্থ রক্ষা করা, পণ্যদ্রব্যের উঁচু মান বজায় রাখা, শহরের ক্রয়-বিক্রয়ের তদারকি ইত্যাদি ছিল বণিক-সংঘের কাজ। এ ছাড়া শহরের শাসন-ব্যবস্থায়ও সংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করত।

৩. মধ্যযুগের শহরগুলিতে লোকসংখ্যা খুব বেশি ছিল না। আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী লোকদের জীবনযাত্রা বিভিন্ন রকমের ছিল। ব্যবসায়ী ও অভিজাত ব্যক্তিরা বিলাসবহুল জীবন কাটাত, কিন্তু দরিদ্রদের খুব কষ্টেই দিন কাটত। কাঁচা রাস্তা, পরিষ্কার জলের অভাব, অন্ধকার পথঘাট, চোর-ডাকাতের উপদ্রব—এই ছিল সেকালের শহরের সাধারণ ছবি।

৪. শহরে লোকেদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি দেশের শাসকরা পছন্দ না করলেও শেষপর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়। রাজকীয় সনদে এই দাবি স্বীকার করে নেওয়া হয়।

৫. মধ্যযুগের শহরগুলি ছিল প্রাচীর-ঘেরা। এদের বলা হত বার্গ। শহরের লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বার্গের চারপাশে শহরতলি গড়ে ওঠে। এই শহরতলির লোকেরাও তাদের বাসস্থানকে নিরাপদ করার জন্য চারপাশে

পাঁচিল তুলে দিত। কালক্রমে এখানেও স্থান-সংকুলান না হওয়ায় এর চারপাশে আবার নূতন শহরতলি গড়ে ওঠে এবং এর পরিধি ক্রমশ বেড়ে যেতে থাকে। পুরনো শহরের লোকজনদের সঙ্গে এইসব নূতন অঞ্চলের লোকদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রায় অনেক পার্থক্য ছিল। এরা মধ্যবিত্ত এবং সমাজে এরা নূতন একটা শ্রেণী গড়ে তোলে। এদের বলা হত বুর্জোয়া।

অনুশীলনী

১। মধ্যযুগে কি কারণে বিভিন্ন স্থানে অনেক শহর গড়ে ওঠে? ধর্মযুদ্ধ কিভাবে শহর গড়ে ওঠার ব্যাপারে সাহায্য করে?

২। বণিক-সংঘ কি? বণিক-সংঘ কি কি কাজ করত?

৩। মধ্যযুগে শহরের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল?

৪। সংক্ষেপে উত্তর দাও:
(ক) কারিগর-সংঘ কিভাবে গড়ে ওঠে? এইসব সংঘ কি কি কাজ করত? (খ) রাজকীয় সনদের সাহায্যে শহরগুলো কিভাবে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা লাভ করে? (গ) বুর্জোয়া কাদের বলা হয়? কিভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর সৃষ্টি হয়?

৫। (ক) মধ্যযুগের কয়েকটি শহরের নাম লেখ। (খ) মধ্যযুগে শহরের আয়তন কিভাবে ধীরে ধীরে বেড়ে যায়? (গ) মধ্যযুগের শহরের রাস্তাঘাট কেমন ছিল?

৬। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:
(ক) প্রত্যেক বণিক-সংঘেই — শ্রেণীর সদস্য থাকত। (খ) মধ্যযুগে শহরে — জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা ছিল না। (গ) মধ্যযুগের সব শহরই — ঘেরা থাকত। (ঘ) মধ্যযুগে শহরগুলো আয়তনে ছিল — — মতো। (ঙ) শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রা — — ছিল।

দশম অধ্যায়

মধ্যযুগে সুদূর প্রাচ্য

ক. মধ্যযুগে চীন

১ম পাঠ—তাং-রাজবংশ (৬১৮—৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ)

মধ্যযুগে চীনের সভ্যতা খুব উন্নতি লাভ করে। হানদের যুগ চীনের ইতিহাসে প্রথম নবজাগরণের যুগ নামে পরিচিত। হান-রাজবংশের

রাজত্বকালেই চীনের সাম্রাজ্যের আয়তন যথেষ্ট বিস্তৃত হয় এবং সমগ্র মধ্যযুগে চীন সাম্রাজ্যের আয়তনের আর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। হানদের পতনের পর কয়েকটি দুর্বল রাজবংশ চীনে রাজত্ব করে। তাদের সময় দেশে নানারকম রাজনৈতিক গোলযোগ দেখা দিলেও চীনের সভ্যতার অগ্রগতি কোনভাবেই থেমে যায়নি। বিশেষত শক্তিশালী তাং-রাজবংশ ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সিংহাসন অধিকার করার পরই চীনের সভ্যতা আরও উন্নত হয়। এজন্য তাং-রাজবংশের রাজত্বকাল চীনের ইতিহাসে দ্বিতীয় নবজাগরণের যুগ নামে পরিচিত।

তাং-রাজবংশ চীনে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে। দুর্বল রাজাদের আমলে চীন সাম্রাজ্যের অনেক অঞ্চল স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। তাং-রাজারা নূতন করে সেইসব অঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করে। ফলে চীনে আবার রাজনৈতিক ঐক্য ফিরে আসে। তাদের আমলে হোয়াং হো, ইয়াংসি ও শি নদীর অববাহিকার সমগ্র অঞ্চল চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সিনকিয়াং অথবা চীনা তুর্কীস্তানের অধিকাংশ অঞ্চলও তাদের সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। উত্তরে চীনের প্রাচীর থেকে সাম্রাজ্যের দক্ষিণ দিকের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত দূরত্ব ছিল ৫,৬০০ মাইল, এবং অপর দিকে তিব্বতের সীমা থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত দূরত্ব ছিল ৩ ১৭০ মাইল। তাং-রাজাদের আমলে চীন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য ছিল। হোয়াং হো-র শাখানদী ওয়েই-এর তীরে চাঙ-আন্ শহরে তাং-রাজাদের রাজধানী ছিল। শাসনের সুবিধার জন্য তাদের রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে এবং প্রদেশগুলি আবার কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। তাং-রাজবংশের দ্বিতীয় সম্রাট তাই-সুং ৬২৭ থেকে ৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীন শাসন করেন। তাঁর আমলে চীন-সাম্রাজ্য দক্ষিণে আনাম এবং পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর ও পারস্যের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সাম্রাজ্যের উত্তর দিকের সীমানা গোবি মরুভূমি এবং আলতাই পর্বত পর্যন্ত প্রসারিত হয়। পরবর্তী সম্রাটের আমলে কোরিয়াও চীন সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে। ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাং-রাজবংশের পতন হয়।

২য় পাঠ—আইন, শৃঙ্খলা, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি ঃ

চীনদেশে শুধু রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করেই তাং-রাজারা সন্তুষ্ট

হয়নি। দীর্ঘকাল রাজনৈতিক অরাজকতার ফলে দেশের শাসনতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়েছিল, আর আইনকানুনও অকেজো হয়ে গিয়েছিল। তাং-রাজাদের আমলে আবার শক্তিশালী শাসনতন্ত্র গড়ে ওঠে। প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন পরিবর্তন করে দেশের প্রচলিত আইন কার্যকর করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ফলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে।

শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চা—তাং-রাজবংশের রাজত্বকালে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হয়। শক্তিশালী শাসনতন্ত্র তৈরি করার উদ্দেশ্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে নূতন করে ঢেলে সাজানো হয়। সরকারি চাকরির জন্য এই সময় থেকেই চীনে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। রাজধানী চাঙ-আনে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সেখানে প্রায় আট হাজার ছাত্র পড়াশুনা করত। সরকারি চাকরিতে যোগ দিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হত। তবে চীনের শিক্ষাপদ্ধতির একটি বড় ত্রুটি ছিল। কন্‌ফুসিয়াসের রচনার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে ছাত্ররা অত্যন্ত গোঁড়া হয়ে উঠত। ফলে রাজকর্মচারী হিসেবে দক্ষ হলেও তারা সংস্কার-বিমুখ বা প্রগতিবিরোধী হত।

সাহিত্য—চীনের সাহিত্য থেকেও তাং-যুগের উন্নত সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের মধ্যে এই যুগে চীনের কবিতা ও কাব্যই সবচেয়ে উন্নতি লাভ করে। প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা চীনের এই যুগের গীতি-কবিতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। লিউ চুং-য়ুয়ান এবং তু ফু তাং-যুগের দুজন বিশিষ্ট কবি। লিউ চুং-য়ুয়ানের রচিত 'বাগানে মধ্যরাত্রি' একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য।

চা—চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দেই পানীয় হিসেবে প্রথম চায়ের প্রচলন শুরু হয়। পরে ধীরে ধীরে চা চীনের সর্বত্রই খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বাইরের দেশগুলিতেও প্রচুর চা রপ্তানি হতে থাকে।

ছাপার কাজ—তাং-যুগে চীনে ছাপার কাজ বা মুদ্রণ-শিল্প খুব উন্নত হয়। চীনই সর্বপ্রথম মুদ্রণযন্ত্র এবং সস্তায় অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর বই ছাপাবার উপায় আবিষ্কার করে। তাং-যুগে কাগজ, কালি ও ছাপার মান আরও উন্নত হয়। ব্লক করে ছবি ছাপার পদ্ধতিও চীনে তখন

আবিষ্কৃত হয়। ৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রোল-করা প্রায় ষোল ফুট লম্বা কাগজ একসঙ্গে ছাপাবার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর থেকেই ওইভাবে চীনের প্রাচীন প্রাচীন সব গ্রন্থ ছাপানো হতে থাকে। কিছুদিন পরেই কাগজের নোট এবং খেলার তাস ছাপানো আরম্ভ হয়। চীনে আবিষ্কৃত এই মুদ্রণ-পদ্ধতি প্রথম আরব অঞ্চলে এবং পরে ইয়োরোপের দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।

শিল্পকলা—তাং-যুগে চীনের অঙ্কনশিল্পের সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়। অঙ্কনবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চীনে হাতে-লেখার পদ্ধতিতেও বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। আঁকার বিষয়বস্তুর বাস্তবরূপ ছবিতে ফুটিয়ে তোলাই ছিল অঙ্কনশিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তাং-যুগে চীনের স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। তবে বাইরের দেশের প্রভাবেই তাং-যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য উন্নতি করার সুযোগ পায়। বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শিল্পকলাও চীনে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে চীনের ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে একদিকে চীনের মানুষের ধর্মীয় মনোভাব আর একদিকে বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। আক্রমণকারীদের হাত থেকে শহর রক্ষার জন্য উচ্চ প্রাচীর, দৃঢ় ফটক প্রভৃতি তৈরির দিকে তাদের বেশি ঝোঁক ছিল। তবে এই যুগে নির্মিত প্যাগোডাগুলোই চীনের সবচেয়ে সুন্দর শিল্পের নিদর্শন।

৩য় পাঠ—ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি ঃ

তিয়েন সান, কুনলুন ও হিমালয় পর্বতের জন্য চীনের পক্ষে মধ্য-এশিয়া ও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে তোলা বেশ কঠিন ছিল। মধ্য-এশিয়ার মরু-অঞ্চলও স্বাভাবিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করত। কিন্তু এত সব বাধা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রাচীন রোমের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে চীনের তৈরি একটি ব্রোঞ্জ পাত্র পাওয়া গিয়েছে। রোমে চীনের সিল্কের খুব চাহিদা ছিল চীন থেকে অনেক রকম মসলাও বাইরের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হত।

তাং-রাজাদের রাজধানী চাঙ-আন থেকে জলপথেও বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ওয়েই ও হোয়াং হো নদীর

পথ ধরে পশ্চিমের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য চলত। খোটান, ইয়ারখন্দ, কাশগড়, সমরখন্দ, ব্যাকট্রিয়া, অ্যান্টিয়োক প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য গড়ে ওঠে। কাশগড়ের পথেই পেশোয়ার এবং গঙ্গার অববাহিকা হয়ে চীনের পণ্যদ্রব্য বঙ্গোপাগর পর্যন্ত পৌঁছত। ভারতের পূর্ব-উপকূলের বিভিন্ন বন্দরের মধ্য দিয়ে চীনের সঙ্গে সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও প্রভৃতি স্থানের বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হয়

তাং-রাজাদের সময় চীনের কৃষিরও খুব উন্নতি হয়। কৃষির উন্নতির জন্য বিভিন্ন নদীতে বাঁধ দিয়ে জল আটকে রাখার ব্যবস্থা করা হত। অনেক নতুন খালও কাটা হয়েছিল। জলসেচ-ব্যবস্থারও অনেক উন্নতি হয়। বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কৃষির উন্নতির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নানাভাবে চাষীদের সাহায্য করা হত।

চীনে বৌদ্ধধর্ম—বৌদ্ধধর্মের দুটি শাখা ছিল—হীনযান ও মহাযান। মহাযান বৌদ্ধধর্ম মধ্য-এশিয়া থেকে চীনদেশে প্রচার লাভ করে। ভারতের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন স্থানের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। এইসব স্থানে ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। সম্রাট কণিষ্কের সময় মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে এই ধর্ম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে চীনেরও বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে চীনের অনেক লোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। ধর্ম প্রচারের জন্য মধ্য-এশিয়া থেকে কয়েক জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীও চীনে যান। তাঁদের চেষ্টায় চীনেও বৌদ্ধধর্ম খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং মূল বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র পাঠ করার জন্য চীনের বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভারতেও আসেন। তাঁদের মধ্যে ফা-হিয়েন ও হিউ এন-সাঙের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করার জন্যও চীনের বহুলোক ভারতে আসত। এইসব তীর্থযাত্রী ও পণ্ডিতদের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম চীনদেশের প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। পরে চীনদেশ থেকেই বৌদ্ধধর্ম জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হয়।

৪র্থ পাঠ—জাপান, কোরিয়া, আনাম প্রভৃতি দেশে চীনের সভ্যতার বিস্তৃতি ঃ

তাং-রাজবংশের আমলে চীনের সঙ্গে জাপান, কোরিয়া, আনাম প্রভৃতি দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এইসব দেশের সভ্যতার তুলনায় তখন চীনের সভ্যতা যথেষ্ট উন্নত ছিল। চীনের সভ্যতার আদর্শে এইসব দেশ নিজেদের সভ্যতাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। চীন দেশ থেকেই এইসব অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। চীন থেকে বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে যান। ফলে জাপান, কোরিয়া, আনাম প্রভৃতি দেশ শুধু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট হয়নি, চীনের পোশাক-পরিচ্ছদ, খেলাধুলা, রান্নার পদ্ধতি ইত্যাদিও গ্রহণ করে। চীনের লিখন-পদ্ধতি, সাহিত্য, কাব্য ও কবিতা এবং সংগীত এইসব অঞ্চলের লোকেরা অনুকরণ করতে শুরু করে। চীনের শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের গভীর প্রভাবও এদের উপর পড়ে। জাপানের রাজধানী নারা ও কিয়োতো চাঙ-আন শহরের অনুকরণে তৈরি করা হয়। শুধু এ বিষয়েই নয়, শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এসব দেশ চীনকে অনুকরণ করতে থাকে।

৫ম পাঠ—হিউ এন-সাঙের ভারত ভ্রমণ ও চীনে প্রত্যাবর্তন ঃ

৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৯ বছর বয়সে চীন সম্রাট তাই-সুঙের রাজধানী সিয়ান-ফু থেকে হিউ এন-সাঙ ভারতের পথে যাত্রা করেন। তখন উত্তর-ভারতের সম্রাট ছিলেন হর্ষবর্ধন। তাসখন্দ, সমরখন্দ, কাশগড় প্রভৃতি স্থান এবং গান্ধার দেশ অতিক্রম করে ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজ্যে প্রবেশ করেন। দীর্ঘ তের বছর তিনি ভারতে বাস করেন। তারপর কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান হয়ে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনে পৌছান। ভারতে থাকার সময় তিনি এই দেশের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য জায়গাগুলিতেই বেড়াতে যান। দেশে ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে একখানা বই লেখেন। হিউ এন-সাঙের ভ্রমণ-কাহিনী চীনা সাহিত্যের একখানি অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। এই ভ্রমণ-কাহিনী থেকে সেকালের ভারতবর্ষের ধর্ম, সমাজ, শাসন-রীতি প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

ভারত-ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফিরে গেলে হিউ এন-সাঙকে খুব সম্মান দেখানো হয়। যেদিন তিনি সিয়ান-ফু পৌঁছুলেন সেদিনটি



সমস্ত চীন সাম্রাজ্যে ছুটির দিন বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। খুব জমকালো ও আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিউ এন-সাঙকে রাজধানীতে অভ্যর্থনা জানানো হয়। হিউ এন-সাঙ প্রচুর বৌদ্ধগ্রন্থ, বুদ্ধমূর্তি ও বুদ্ধদেবের ব্যবহৃত বহু জিনিসপত্র দেশে নিয়ে যান।

সম্রাট তাই-সুঙ নিজে এসে হিউ এন-সাঙের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যান এবং তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করেন বন্ধুর মতো। ভারত সম্পর্কে সম্রাট হিউ এন-সাঙকে বহু প্রশ্ন করেন। কিন্তু হিউ এন-সাঙ শুধু বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আলোচনায় আগ্রহ দেখান। হিউ এন-সাঙের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের কাজে লাগাবার জন্য তিনি তাঁকে সরকারী কাজে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। হিউ এন-সাঙ সম্রাটের প্রস্তাবে রাজি হলেন না। তখন সম্রাট ভারতবাসীরা

যাতে চীনের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে সেজন্য তাঁকে লাওৎসে-এর রচনা সংস্কৃতভাষায় অনুবাদ করার অনুরোধ করেন। কিন্তু হিউ এন-সাঙ সম্রাটের এই অনুরোধ রাখলেন না। তিনি বাকি জীবন একটি মঠে কাটিয়ে দেন এবং বৌদ্ধধর্মের অনেক গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। হিউ এন-সাঙের এই কাজের ফলে বৌদ্ধধর্ম চীনে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।


হিউ এন-সাঙ

৬ষ্ঠ পাঠ—সুঙ-রাজবংশ (৯৬০-১২৮০ খ্রীষ্টাব্দ)

৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাং-রাজবংশের পতন হয়। তারপর কিছুদিন চীনের রাজনীতিতে অস্থিরতা চলে। ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাই স্থ নামে এক বীর যোদ্ধা সুঙ-রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। সুঙদের আমলে আবার চীনের গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে কুবলাই খান চীন অধিকার করলে সুঙদের রাজত্বের অবসান হয়।

সুঙ-রাজাদের আমলে চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি খুব উন্নতি লাভ করে। দেশের লোকসংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যায়। তবে চীনের এই সমৃদ্ধির জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন ওয়াং আন-সি নামে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। সরকারী কাজে যোগ দেওয়ার পরই তিনি প্রচলিত শাসননীতির অনেক পরিবর্তন করেন। তিনি মনে করতেন যে দেশের জনসাধারণের মঙ্গল করাই সরকারের প্রধান কর্তব্য। জনসাধারণের স্বার্থেই রাষ্ট্রকে দেশের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি প্রভৃতি পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে দেশের বড়লোকেরা শ্রমিক ও গরিবদের নানাভাবে শোষণ করবে। শ্রমিকদের বেগার খাটার প্রথা বহুদিন ধরেই চীনে চালু ছিল। তিনি এই প্রথা বন্ধ করে দেন। কৃষকদের কথা ভেবে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক বড় বড় পরিকল্পনা

গ্রহণ করে তিনি সেগুলি কাজে পরিণত করার ব্যবস্থা করেন। সুদখোর মহাজনদের হাত থেকেও তিনি গরিব কৃষকদের রক্ষা করেন। তাঁর চেষ্টায়ই খুব কম সুদে রাজকোষ থেকে যাতে তারা টাকা পেতে পারে সে-ব্যবস্থা হয়। ফসল ঘরে তোলার পর ঋণ শোধ করবে—এই শর্তে তিনি বেকার চাষীদেরও রাজকোষ থেকে অর্থ, প্রয়োজনীয় বীজ ও কৃষির সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করেন। শ্রমিকদের বেতন ও নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করে বোর্ড গঠন করা হত।

সরকারই দেশের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। সমস্ত খাদ্যশস্য সরকারের পক্ষ থেকে কিনে নেওয়া হত। ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা ভেবে প্রচুর খাদ্যশস্য সঞ্চয় করে রাখা হত। বাকি খাদ্যশস্য প্রয়োজন অনুসারে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠাবার ও সরকারী দোকান থেকে বিক্রি করার ব্যবস্থা ছিল। সরকারী আয়-ব্যয়ের ঠিকঠিক হিসাব রাখার জন্য একটি বাজেট কমিশন নিয়োগ করা হত। সরকারের কোন বিভাগেরই এই কমিশনের বরাদ্দ অর্থের চেয়ে বেশি ব্যয় করার অধিকার ছিল না। সরকারী বিভাগগুলি এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে বহু অর্থ অপচয় বন্ধ হয়। সম্পত্তির উপর কর বসানো হয়। বৃদ্ধ, বেকার ও গরিবদের পেনসন দেওয়ার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়।

সুঙদের রাজত্বকালে শিক্ষা-পদ্ধতির অনেক সংস্কার করা হয়। এই সময় থেকেই সাহিত্য, কনফুসিয়াসের দর্শন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রীতি-নীতি এবং মুখস্থ বিদ্যার উপর জোর দেওয়া কমতে থাকে। শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়। পরীক্ষার নিয়মকানুনেরও পরিবর্তন করা হয়। ছাত্রদের জন্য ইতিহাস, ভূগোল, অর্থবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় অবশ্য-পাঠ্যরূপে গণ্য হতে থাকে। শিক্ষাজগতের এই পরিবর্তন চীনের সংস্কৃতির উপরেও গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে সুঙ-যুগে চীন খুব উন্নত হয়ে ওঠে।

৭ম পাঠ—য়ুয়ান রাজবংশ (১২৮০—১৩৬৮) খ্রীষ্টাব্দ

মধ্য-এশিয়ায় তাতার বা মোঙ্গল জাতি বাস করত। হূণদের মতো মোঙ্গলরাও ছিল যাযাবর। কিন্তু হূণদের চাইতেও তারা ছিল অনেক

বেশি নৃশংস। তবে তাদের একটি গুণ ছিল। অতি অল্প সময়ের তারা পরাজিত জাতির সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিজেদের উন্নত করে তোলার চেষ্টা করত।

আমুর ও হোয়াং হো নদীর মাঝামাঝি অঞ্চলে বর্তমান মঙ্গোলিয়ায় মোঙ্গলরা বাস করত। পরে নিজেদের বাসভূমি ত্যাগ করে তারা পারস্য, ভারত ও টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। মোঙ্গলদের আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই চীনের প্রাচীর তৈরি করা হয়েছিল। মোঙ্গল-নেতা চেঙ্গিস খানের আমলে মোঙ্গলদের বিভিন্ন দলের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে ওঠে। চেঙ্গিস খানের আমলেই মোঙ্গলরা পিকিং ও তার আশেপাশে নিজেদের অধিকার স্থাপন করে। ধীরে ধীরে চীনে মোঙ্গলদের রাজত্ব গড়ে ওঠে। ১২৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কুবলাই খান চীনদেশের কিছু অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে চীনের ঐতিহাসিকরা কুবলাই খানকে চীনের সম্রাট রূপে বর্ণনা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ য়ুয়ান রাজবংশ নামে পরিচিত। ১২৮০ থেকে ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত য়ুয়ান রাজবংশ চীনে রাজত্ব করে।



কুবলাই খান

কুবলাই খান—১২৫৯ থেকে ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কুবলাই খান চীনে রাজত্ব করেন। তিব্বত ও দক্ষিণ চীনও তিনি অধিকার করেন। কুবলাই খানের আমল থেকেই মোঙ্গলরা চীনের সভ্যতা গ্রহণ করে। তাদের স্বভাবেরও অনেক পরিবর্তন হয়। লুটপাট, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি ধ্বংসের কাজ তারা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে। কুবলাই খানের রাজধানী ছিল ক্যাম্বুল্যাক। ক্যাম্বুল্যাকেরই বর্তমান নাম পিকিং (বা পেইচিং)। কুবলাই খানের রাজসভা জাঁকজমক, আড়ম্বর এবং নানারকম অনুষ্ঠানের জন্য বেশ খ্যাতি লাভ করে। মোঙ্গলদের সুশাসনের ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প খুব

সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। নূতন নূতন অনেক বাণিজ্য-কেন্দ্র ও শহরের পত্তন হয়। এই সময় থেকে চীনের সঙ্গে তিব্বতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিব্বতের লোকেরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে।

৮ম পাঠ—মার্কো পোলোর বিবরণ ঃ

১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইটালির ভেনিস ও জেনোয়ার মধ্যে এক নৌ-যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ভেনিসের সাত হাজার সৈন্য জেনোয়ার কাছে বন্দী হয়। বন্দীদের মধ্যে ভেনিসের বিখ্যাত ভ্রমণকারী মার্কো পোলোও ছিলেন। বন্দী-জীবনের একঘেয়েমি কাটাবার জন্য মার্কো পোলো তাঁর দেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে একখানা বই লেখেন। রাসটিসিয়ানো নামে আর-একজন বন্দী তাঁর লিপিকারের কাজ করেন। বইটির নাম মার্কো পোলোর ভ্রমণ-কাহিনী। মার্কো পোলোর ভ্রমণ-কাহিনী পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ। মার্কো পোলোর বই পড়েই ইয়োরোপের লোকের প্রাচ্যদেশ সম্পর্কে জানবার আগ্রহ বেড়ে যায়।

মার্কো পোলোর বাবা নিকোলো পোলো ও কাকা মাফিয়ো পোলোর চীনে যাওয়ার কাহিনী দিয়ে বইখানির শুরু। ভেনিসের ব্যবসায়ী নিকোলো ও মাফিয়ো কনস্ট্যান্টিনোপলে ব্যবসা করতেন। ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁরা ক্রিমিয়া, কাজান ও বোখারায় যান। বোখারায় কুবলাই খানের কয়েকজন অনুচরের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটে। তাদের অনুরোধে নিকোলো ও মাফিয়ো কুবলাই খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য চীনে যান। তাঁদের কথাবার্তা ও ব্যবহারে



মার্কো পোলো

কুবলাই খান খুব সন্তুষ্ট হয়ে খ্রীষ্টানদের সভ্যতার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি চীনে খ্রীষ্টান ধর্ম ও ইয়োরোপের সভ্যতা প্রসারের উদ্দেশ্যে শিক্ষিত ও উপযুক্ত এক শ জন লোক পাঠাবার জন্য পোপকে অনুরোধ করেন। কুবলাই খানের দূত হিসেবে নিকোলো

ও মাফিয়ো রোমে পোপের কাছে উপস্থিত হন। কিন্তু রোমে তখন খুব বিশৃঙ্খলা চলছিল। ফলে দু-বছর অপেক্ষা করার পর মাত্র দুজন ধর্ম-প্রচারক সঙ্গে নিয়ে তাঁরা আবার চীনে রওনা দেন। নিকোলোর ছেলে মার্কো পোলো এবার তাঁদের সঙ্গী হন। মার্কো পোলো খুব বুদ্ধিমান আর চালাকচতুর ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাতারদের ভাষা শিখে ফেললেন। কুবলাই খানও তাঁকে খুব পছন্দ করেন এবং সরকারী কাজে তাঁকে নিযুক্ত করেন। সরকারী কাজে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় তিনি বেশ কিছুদিন থাকতে বাধ্য হন। ঐ অঞ্চলের শস্যশ্যামল প্রান্তর, ফুল ও ফলের বাগান, অতিথির প্রতি জনসাধারণের সদ্ব্যবহার, মূল্যবান অলঙ্কার ও সুন্দর পোশাকে সজ্জিত নরনারী এবং নানা কারুকাজ-করা অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ মার্কো পোলোকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে।

মার্কো পোলোর বর্ণনায় ব্রহ্মদেশেরও উল্লেখ আছে। মোঙ্গলদের পেগু-জয়ের কাহিনী তিনি খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু জাপানের কথা আলোচনা করার সময় তিনি সে-দেশের ধনসম্পদের বড় বেশি অতিরঞ্জিত বর্ণনা দিয়েছেন। চীনের একদল খ্রীষ্টানের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। মার্কো পোলো তিন বছরের জন্য ইয়াং-চো শহরের শাসনকর্তাও নিযুক্ত হন। চীনের দূত হিসেবে তিনি সম্ভবত ভারতেও এসেছিলেন।

রোম থেকে চীনে পৌঁছতে মার্কো পোলো ও তাঁর সঙ্গীদের প্রায় সাড়ে তিন বছর সময় লাগে। তারপর ষোল বছরের বেশি সময় তাঁরা চীনে বাস করেন। কুবলাই খান তাঁদের খুবই পছন্দ করেন দেখে একদল লোকের মনে ঈর্ষা জাগে। মার্কো পোলো ও তাঁর সঙ্গীরা তা বুঝতে পেরে চীন ত্যাগ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কুবলাই খান কিছুতেই তাঁদের ছেড়ে দিতে রাজি হন না। কিন্তু হঠাৎ এই সময় একটা সুযোগ এসে যায়। পারস্যের মোঙ্গল-সম্রাট আরগনের রানী মারা যান। সম্রাট মোঙ্গল ছাড়া অন্য কোন জাতির মেয়ে বিয়ে করবেন না। উপযুক্ত পাত্রী পাঠানোর জন্য তিনি পিকিংয়ে দূত পাঠান। পারস্যের ভাবী রানীর দেহরক্ষী হিসেবে বিশ্বাসী ও অভিজ্ঞ ভ্রমণকারী মার্কো পোলো ও তাঁর সঙ্গীরা পারস্য হয়ে দেশে ফেরার সুযোগ পান।

মার্কো পোলোদের জাহাজ দক্ষিণ-চীনের কোন-এক বন্দর থেকে পারস্যের পথে যাত্রা করে। সুমাত্রা, দক্ষিণ-ভারত প্রভৃতি স্থানে



বহুদিন অপেক্ষা করার পর প্রায় দু-বছর পরে তাঁরা পারস্যে পৌঁছান। ইতিমধ্যে আরগন মারা গিয়েছেন। এখন আরগনের ছেলের সঙ্গেই চীন থেকে-আনা এই মেয়েটির বিয়ে হয়। রাজার বিয়ের পর মার্কো পোলো ও তাঁর সঙ্গীরা এবার স্বদেশে রওনা হন। তাব্রিজ, ত্রেবিজন্দ কনস্ট্যান্টিনোপল হয়ে ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা ভেনিসে পৌঁছান।

ভেনিসে ফিরে এসেও তাঁরা বিপদে পড়েন। দীর্ঘ দিন অনুপস্থিত থাকায় সবাই তাঁদের কথা ভুলে গিয়েছে। বিশেষত তাতারদের পোশাক-পরা নিকোলো, মাফিয়ো এবং মার্কো পোলোকে সবাই বিদেশী পর্যটক বলে মনে করে। কিন্তু পরে এক ভোজসভার আয়োজন করে তাঁরা যখন মহামূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ পরে সেখানে হাজির হলেন সবাই তাঁদের চিনতে পারে এবং খুব সমাদরে তাঁদের গ্রহণ করে। কিন্তু সবসময় লাখ লাখ লোক, লাখ-লাখ টাকা প্রভৃতির গল্প করতেন বলে মার্কো পোলোকে আড়ালে সবাই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্কো পোলোর মৃত্যু হয়।

খ. মধ্যযুগে জাপান

১ম পাঠ—জাপানের সমাজ ও সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ঃ

মধ্যযুগের প্রথম দিকে জাপানের সমাজে আট শ্রেণীর লোক ছিল। কিন্তু পরে সামুরাই বা যোদ্ধা, কৃষক, কারিগর ও ব্যবসায়ী—এই চারটি শ্রেণী নিয়ে জাপানের সমাজ গড়ে ওঠে। তবে সমাজ-জীবনে ব্যবসায়ীদের কোন সম্মান ছিল না। এই চারটি শ্রেণী ছাড়াও দেশে প্রচুর ক্রীতদাস ছিল। অপরাধী, যুদ্ধবন্দী, চুরি করে নিয়ে-আসা ছেলেমেয়ে ও বাজারে বিক্রি-করা লোকেরা ক্রীতদাসে পরিণত হত। সমাজে সবচেয়ে নিচু শ্রেণীর লোকেরা 'ইতা' নামে পরিচিত ছিল। ঝাড়ুদার, চর্মকার, কসাই প্রভৃতি ছিল এই শ্রেণীর লোক।

জাপানের সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। দেশের অর্থনীতিও গড়ে ওঠে সামন্ততন্ত্রের উপর নির্ভর করে। রাজা বা মিকাডো ছিলেন দেশের সর্বেসর্বা। জমিদাররা রাজার কাছ থেকে সব জমি ইজারা নিত। কৃষকেরা জমি চাষ করত। জমির উন্নতির জন্য সরকার থেকে কৃষকদের ঋণ দেওয়া হত। কিন্তু পাথুরে মাটিতে ফসল ফলাতে কৃষকদের খুব পরিশ্রম করতে হত। তা ছাড়া প্রত্যেক কৃষক বছরে ত্রিশ দিন জমিদারের জমিতে কাজ করতে বাধ্য ছিল। তখন এক মুহূর্ত কাজে ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে তার মৃত্যুদণ্ডও হতে পারত। বেগার-খাটা ছাড়াও কৃষকদের নানাপ্রকার কর দিতে হত। বাইরের জগতের সঙ্গে খুব বেশি যোগাযোগ না থাকার জন্য মধ্যযুগে জাপানের ব্যবসা-বাণিজ্য খুব উন্নত হতে পারেনি। জমির উৎপাদন-ক্ষমতার উপরই দেশের সমৃদ্ধি প্রায় পুরোপুরি নির্ভর করত।

২য় পাঠ—মিকাডোর প্রাধান্য ঃ

জাপানের সম্রাট অনেক সুন্দর সুন্দর উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কখনও তাঁকে 'তেন্‌সি' বা ঈশ্বরের পুত্র বলা হত। সাধারণভাবে তাঁকে 'তেন্নো' বা স্বর্গীয় রাজা এবং কখনও কখনও 'মিকাডো' বা পবিত্র-তোরণ বলা হত। সাধারণত সম্রাটের বড় ছেলেই সিংহাসন পেতেন। সম্রাটই ছিলেন রাজ্যের সর্বেসর্বা। প্রজারা সম্রাটকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করত।

চীন-জাপান সম্পর্ক—৮৯৮ থেকে ৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দাইগো ছিলেন জাপানের সম্রাট। তিনি খুব জ্ঞানী ও গুণী ছিলেন। সম্রাট দাইগোর আমলেই চীনের সঙ্গে জাপানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সময়েই জাপান চীনের সভ্যতাকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। চীন থেকে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই চীনের সভ্যতাও জাপানে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। চীনের পোশাক-পরিচ্ছদ, খেলা-ধুলা, রান্নার পদ্ধতি, লিখন-পদ্ধতি, মৃৎশিল্প ও শাসনপদ্ধতি জাপানের লোকেরা অনুসরণ করতে শুরু করে। জাপানের ভাস্কর্য ও স্থাপত্যেও চীনা প্রভাব পড়ে।

চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে জাপানের রাজনীতিতেও পরিবর্তন দেখা দেয়। চীনের মতো জাপানেও স্থায়ী ও শক্তিশালী সরকার গড়ে ওঠে। জাপানের ইতিহাসে এই যুগ 'সুবর্ণ যুগ' নামে পরিচিত। শিল্প, সাহিত্য, অঙ্কনবিদ্যা প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়েই জাপান খুব উন্নতি করে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও খুব সমৃদ্ধ হয়।

প্রভাবশালী জমিদার-পরিবারের উত্থান—জাপানের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ-দরবারের জাঁকজমক ও আড়ম্বর যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যায়। বিনা কারণে প্রচুর অর্থব্যয়ের ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। রাজশক্তি ক্রমেই দুর্বল হতে থাকে। দেশেও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অপরাধীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। এই অরাজকতার সুযোগ নিয়ে একদল সামরিক নেতা দেশের বিভিন্ন স্থানে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করে। এইসব সামরিক নেতা সগুন নামে পরিচিত। রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করার জন্য তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। রাজার ক্ষমতা তারা সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে এবং রাজাকে শুধু ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করতে ও সম্মান দিতে রাজী হয়। রাজা ও রাজপরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে তারা স্বীকার করে। দুর্বল রাজা কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করতে অক্ষম বলে, কৃষকরা সম্রাটের বদলে সগুন বা সেনাপতিদের কর দিতে শুরু করে। কারণ একমাত্র সেনাপতিরাই দস্যুদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে পারত।

১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে মিনামোতো গোষ্ঠীর নেতা য়োরিতোমো সামরিক

শক্তির জোরে সমস্ত জাপানের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। সম্রাটও বাধ্য হয়ে তার কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেন। কিন্তু ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে য়োরিতোমোর মৃত্যুর পর হোজো-পরিবার জাপান, সগুন ও সম্রাটের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। এই সময় কুবলাই খান জাপান আক্রমণ করেন। কিন্তু জাপান-জয়ে তিনি ব্যর্থ হন। ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হোজোদের শাসনকাল শেষ হয়। হোজো-গোষ্ঠীর শেষ শাসক তাকাতোকির দুর্বলতার সুযোগে জাপান-সম্রাট গো দাইগো আবার দেশের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। হোজোদের প্রতিদ্বন্দ্বী মিনামোতো ও আশিকাসা গোষ্ঠীর সন্তানরা রাজাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। তাকাতোকি ও তাঁর ৮৭০ জন সামন্ত হারা-কিরি (পেট চিরে আত্মহত্যা) করেন। তাকাতোকির মৃত্যুর পর আশিকাসা তাকাউজি রাজার বিরুদ্ধে চলে যান এবং গো দাইগোকে সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজের পছন্দমতো কোগোনকে সম্রাটের সিংহাসনে বসান। আশিকাসা গোষ্ঠীর সগুনরা প্রায় দু-শ পঞ্চাশ বছর জাপান শাসন করে। তাদের শাসনকালে দেশে অশান্তি দেখা দেয়। তখন নোবুনাগা, হিদেয়োশি এবং ইয়েয়াস্থ নামে তিনজন জলদস্যু জাপানে আবার রাজনৈতিক শান্তি ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে। ইয়েয়াস্থর নেতৃত্বে জাপানের টকুগাওয়া গোষ্ঠীর শাসনে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে।

নোবুনাগা, হিদেয়োশি এবং ইয়েয়াস্থর সাহায্যে মিকাডো সগুনদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার সংকল্প করেন। এই উদ্দেশ্যে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তিনি শিণ্টো ধর্মকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন। শিণ্টো হল জাপানের অধিবাসীদের প্রধান ধর্ম।

প্রজাদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে মিকাডো নিজে শিণ্টো ধর্মের প্রধান পুরোহিতের পদ গ্রহণ করেন। এইভাবে তিনি ধর্মীয় প্রভাব কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক শক্তি বাড়িয়ে তোলেন। প্রজাদের সাহায্যে সগুনদের বিতাড়িত করে নিজেকে সর্বশক্তিমান সম্রাট রূপে ঘোষণা করার কথাও চিন্তা করেন। কিন্তু রাজশক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখে জাপানের বিভিন্ন সামরিক গোষ্ঠী অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও রাজার শক্তি-বৃদ্ধির এই প্রচেষ্টাকে

খুব সুনজরে দেখেনি। হিদেয়োশির শাসনকালে মিকাডো নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার সুযোগ পান। কিন্তু ইয়েয়াসু খুব দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি সম্রাটের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা খুব সন্দেহের চোখে দেখতেন। দেশের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদেরও এই সম্পর্কে তিনি সতর্ক করে দেন। ইয়েয়াসুর উত্তরাধিকারীরাও তাঁর এই নীতি অনুসরণ করেন এবং সম্রাটের ক্ষমতা বৃদ্ধির কোন সুযোগই তাঁরা দেননি। অন্যান্য গোষ্ঠীর নেতারাও এই ব্যাপারে সগুনদের সাহায্য করে।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও রাজশক্তি-বৃদ্ধির বিরোধী ছিলেন। বিশেষত সম্রাট শিন্টো ধর্মের প্রধান পুরোহিতের পদ গ্রহণ করলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। নিজেদের স্বার্থ, বিষয়-সম্পত্তি ও ধর্মের প্রাধান্য রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁরা রাজার বিরোধিতা শুরু করেন। রাজনৈতিক-ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন গোষ্ঠী ও প্রতিপত্তি-শালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বিরোধিতার ফলে সম্রাটের পক্ষে ক্ষমতা বাড়ানো একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। টকুগাওয়া সগুনরা বাইরের লোকের সঙ্গে মিকাডোর দেখা-সাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ করে দেন। কিছু অলস পারিষদ এবং এক বিশাল নারীবাহিনী নিয়ে সম্রাট কিতো শহরের রাজপ্রসাদে প্রায় বন্দী-জীবন কাটাতে বাধ্য হন।

৩য় পাঠ—সগুন ঃ

সম্রাটের ক্ষমতা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সগুনদের প্রতিপত্তি ক্রমেই বেড়ে যেতে শুরু করে। ধীরে ধীরে রাজার সমস্ত ক্ষমতাই তাদের অধিকারে চলে যায়। বলদে-টানা গাড়ি অথবা পালকি চড়ে কোন সগুনের কোথাও যাবার সময় রাজপথের ত্ব-পাশে সতর্ক প্রহরী মোতায়েন থাকত। রাস্তার ত্ব-ধারের বাড়ির জানালা-দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত। কোন বাড়িতেই তখন কেউ আগুন জ্বালাতে পারত না। কুকুর-বিড়ালগুলোকে পর্যন্ত আটকে রাখা হত। আর সমস্ত লোক হাঁটু গেড়ে বসে মাটির উপর হাত রেখে মাথা নিচু করে থাকতে বাধ্য হত।

এক বিশাল সৈন্যবাহিনী সগুনদের দেহরক্ষীর কাজ করত। সগুনদের মনোরঞ্জন করার জন্য চারজন ভাঁড় এবং আটজন শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির ভদ্রমহিলা সবসময় তাদের সঙ্গে থাকত। শাসন-

কার্যের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ১২ জন সদস্য নিয়ে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হত। মন্ত্রিপরিষদে একজন প্রধানমন্ত্রী, পাঁচজন মন্ত্রী এবং ছ-জন সাহায্যকারী থাকত। শাসনব্যবস্থার প্রতিটি বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার জন্য একটি বোর্ড গঠন করা হত। বড় বড় সামন্তদের কাজের উপর লক্ষ্য রাখাও ছিল এই বোর্ডের আর-একটি প্রধান কাজ। কারণ বড় বড় সামন্তদের অনেকেই একমাত্র জাপানের সম্রাটের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করত আর সগুনদের বিরোধিতা করার সুযোগ খুঁজে বেড়াত।

৪র্থ পাঠ—সামুরাই ঃ

প্রত্যেক সামন্তের অধীনে অনেক সামুরাই বা যোদ্ধা-শ্রেণীর লোক থাকত। জাপানের সামন্তপ্রথার মূল কথাই ছিল প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই যোদ্ধা, আর প্রত্যেক যোদ্ধাই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। যুদ্ধবিদ্যা শেখার দিকে তাদের যত আগ্রহ ছিল, লেখাপড়া শেখার দিকে ততটা নয়। সামুরাইরা অনেক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। তাদের কোন কর দিতে হত না। জীবনধারণের জন্য খাদ্য-শস্য ভাতা হিসেবে তারা জমিদারের কাছ থেকে ধান ও অন্যান্য শস্যাদি পেত। তবে যুদ্ধ বাধলে তাদের যুদ্ধে যোগ দিতে হত। প্রকৃতপক্ষে তরবারিই ছিল সামুরাইদের প্রাণ। এমন কি শান্তির সময়েও তারা ইচ্ছেমতো তরবারি ব্যবহার করতে দ্বিধা করত না। নিম্নশ্রেণীর কোন লোক কোন সামুরাইকে অপমান করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেরে ফেলা হত। নূতন তরবারির ধার পরীক্ষা করার জন্য সামুরাই কোন ভিক্ষুককে বা কুকুরকে কেটে ফেলতে পারত। যুদ্ধ ছাড়া জুয়ো-খেলা এবং ঝগড়াঝাঁটি ও মারামারি করায়ও সামুরাইদের প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল। আর অনেক সময়ই সামুরাইদের ঝগড়াঝাঁটির শেষ নিষ্পত্তি হত তরবারিতেই।

৫ম পাঠ—জাপানের শিভ্যালরি বা বীরধর্ম (বুশিদো) ঃ

সামুরাইরা যে শুধু যুদ্ধপ্রিয় ছিল তা নয়, তারা মরতেও বিন্দুমাত্র ভয় পেত না। বীরের মর্যাদা সম্পর্কে তাদের মনোভাব ছিল অত্যন্ত কঠোর। যে-কোন ভাবে বীরের মর্যাদা রক্ষা করাই ছিল তাদের জীবন-নীতি। এই নীতিকে 'বুশিদো' অথবা বীরের ধর্ম বলে। এই নীতির মূল কথা—যুক্তি দিয়ে কোন-কিছু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং

একটুও দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে প্রয়োজনের সময় মৃত্যুবরণ করা অথবা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া। সামুরাইরা কোন অপরাধ করলে বিশেষ আইন অনুযায়ী তাদের বিচার করা হত। সাধারণ আইনের তুলনায় এই আইন অনেক বেশি কঠোর ছিল। তারা যে-কোন ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারকে ও লাভ-লোকসানকে ঘৃণার চোখে দেখত। তারা টাকা ধার দিতে, ধার করতে অথবা টাকা গুনতে অস্বীকার করত। কোন শপথ তারা কখনও লঙ্ঘন করত না। সত্যিকারের প্রয়োজনের সময় কেউ তাদের কাছে এসে কোন সাহায্য চাইলে তারা তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকত। তারা অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিল এবং খুব সংযত জীবন কাটাত। সারাদিনে একবারই তারা খাবার খেত এবং যা জুটত তাই খেয়ে নিত। নিঃশব্দে তারা দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা ও অত্যাচার সহ্য করত। কখনও কোন রকম উচ্ছ্বাস তারা প্রকাশ করত না। সামুরাইদের স্ত্রীদেরও ধৈর্যের সীমা ছিল না। যুদ্ধে স্বামীর মৃত্যু হলে তারা বিলাপ না করে স্বামীর বীরত্বের কথা স্মরণে আনন্দ পেত।

উপরিওয়ালার প্রতি অনুগত থাকাই ছিল সামুরাইদের সবচেয়ে বড় ধর্ম। সামন্তদের মৃত্যুর পর সামুরাইরা সামন্তকে পরলোকে গিয়ে পরিচর্যা করার জন্য নিজেদের পেট চিরে মৃত্যুবরণ করত। 'বুশিদো'র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রথা ছিল হারা-কিরি বা পেট চিরে আত্মহত্যা করা। বিভিন্ন কারণেই সামুরাইরা হারা-কিরি করত। তবে আত্মসম্মান এবং উপরিওয়ালার প্রতি আনুগত্য রক্ষাই হারা-কিরির প্রধান দুটি কারণ।

মনে রাখবে

১. হান-রাজবংশের পর চীনে তাং-রাজবংশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনের ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় নবজাগরণের যুগ। তাং-রাজবংশ (৬১৮—৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে) চীনে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। নানা খণ্ডে বিভক্ত চীনদেশে আবার রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়। পুরনো আইনবিধির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয় এবং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। শিক্ষাব্যবস্থায়ও কিছু রদ-বদল ঘটে। শিল্প-সাহিত্যে অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। চীনই মুদ্রণ-শিল্পের স্রষ্টা এবং তাং-যুগে মুদ্রণের খুব উন্নতি ঘটে। পানীয় হিসেবে চা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং বিদেশেও চা রপ্তানি শুরু হয়।

২. ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিরও খুব উন্নতি ঘটে। খোটান, ইয়ারখন্দ, সমরখন্দ, কাশগড়, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও প্রভৃতি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও উন্নত জলসেচ-ব্যবস্থার ফলে কৃষি-পণ্যের উৎপাদন খুব বেড়ে যায় এবং দেশের বৈষয়িক উন্নতি ঘটে।

৩. এ সময়ে চীনে মহাযান-বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচার ঘটে। পরে এই চীনদের থেকেই বৌদ্ধধর্ম জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

৪. চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ ৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসেন। দীর্ঘ তের বৎসর ভারতে কাটিয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে যান। যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যান প্রচুর বৌদ্ধগ্রন্থ, বুদ্ধমূর্তি ও বুদ্ধদেবের ব্যবহৃত জিনিসপত্রাদি, চীনা ভাষায় বৌদ্ধধর্মের অনেক বই তিনি অনুবাদ করেন। এভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি—বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে চীনের যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

৫. তাং-রাজবংশের পতনের পর চীনের সাময়িক অন্ধকারের কাল। এরপর সুঙ-রাজবংশের আমলে (৯৬০-১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে) চীনে আবার গৌরবের দিন ফিরে আসে। রাজাদের উৎসাহে শিক্ষা-সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি ঘটে। জনসাধারণের স্বার্থে রাষ্ট্রই ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। রাজকোষ থেকে অল্প সুদে চাষীদের টাকা ধার দেওয়া হত। সম্পত্তির উপর কর বসানো হয়।

৬. এরপর য়ুয়ান-যুগ (১২৮০-১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) যাযাবর সম্প্রদায়ের একটি হল মোঙ্গল। এদের নেতা কুবলাই খান ১২৫৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশের খানিকটা অংশ দখল করেন এবং পরে ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনের সম্রাটরূপে স্বীকৃতি পান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ য়ুয়ান-বংশ নামে খ্যাত। এঁদের শাসনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটে। কুবলাই খানের রাজধানী ক্যাম্বুল্যাক শহরই বর্তমাসে পেইচিং বা পিকিং নামে পরিচিত।

৭. ভেনিসের বিখ্যাত ভ্রমণকারী মার্কো পোলো কুবলাই খানের রাজত্বকালে চীনে আসেন। সম্রাট তাঁকে খুব পছন্দ করেন এবং তাঁকে সরকারী কাজে নিয়োগ করেন। এই সূত্রে মার্কো পোলো বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সুযোগ পান এবং সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটি লেখেন—'মার্কো পোলোর ভ্রমণ-কাহিনী'। ইয়োরোপীয়দের মনে প্রাচ্যদেশ সম্পর্কে আগ্রহ জাগিয়ে তোলে এই ভ্রমণ-কাহিনীটি।

৮. মধ্যযুগে জাপানের সমাজ ও অর্থনীতি ছিল সামন্ততান্ত্রিক। 'মিকাডো' অর্থাৎ সম্রাট ছিলেন দেশের সর্বেসর্বা। চীনের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। চীনের মতো জাপানেও স্থায়ী শক্তিশালী সরকার গড়ে ওঠে। কিন্তু ক্রমে বিলাসবহুল রাজকীয় আড়ম্বরে রাজকোষ শূন্য হতে থাকে, রাজশক্তিও

দুর্বল হয়ে পড়ে। দেশব্যাপী অরাজকতার মধ্যে একদল শক্তিশালী সামরিক নেতার অভ্যুত্থান ঘটে। এরা 'সগুন' নামে পরিচিত। এদিকে 'মিকাডো' একই সঙ্গে ধর্মগুরু ও রাজনৈতিক প্রধান রূপে নিজের ক্ষমতা বজায় রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বিভিন্ন গোষ্ঠীর বংশানুক্রমিক ক্ষমতা দখলের জন্য লড়াই এবং বৌদ্ধ যাজকের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টার ফলে কেন্দ্রীয় শক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে।

৯. জাপানে সামন্তপ্রথার মূল কথা হল—প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই সামুরাই বা যোদ্ধা, আর প্রত্যেক যোদ্ধাই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বীরের মর্যাদা রক্ষা করাই ছিল সামুরাইদের জীবন-নীতি। এই বীরধর্মকে বলা হত 'বুশিদো'।

অনুশীলনী

১। তাং-রাজবংশের রাজত্বকালে চীনের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। তাং-রাজবংশের রাজত্বকালে চীনদেশের আইন-শৃঙ্খলা, সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

৩। তাং-রাজবংশের রাজত্বকালে চীনদেশের ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতির অবস্থা কিরূপ ছিল ?

৪। চীনে বৌদ্ধধর্ম কিভাবে বিস্তার লাভ করে ?

৫। হিউ এন-সাঙের ভারত-ভ্রমণ ও চীনে ফিরে যাওয়ার কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৬। সুঙ-রাজবংশের আমলে চীনদেশের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৭। য়ুয়ান-রাজবংশের আমলে চীনদেশের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৮। মার্কো পোলো কে ছিলেন ? তাঁর বিবরণ থেকে কি জানা যায় ?

৯। কুবলাই খান সম্পর্কে কি জান ?

১০। মধ্যযুগে জাপানের সমাজ ও অর্থনীতি কিরূপ ছিল ?

১১। মধ্যযুগে জাপানের সঙ্গে চীনের কিরূপ সম্পর্ক ছিল ?

১২। জাপানে কিভাবে প্রভাবশালী জমিদার পরিবারের উত্থান হয় ? এই সব জমিদারের পরিবার কিভাবে জাপানের রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করে ?

১৩। জাপানের সগুনদের সম্পর্কে কি জান ?

১৪। সামুরাই কাদের বলা হয় ? সামুরাইরা কি কি কাজ করত ?

১৫। বুশিদো কি ? জাপানের বুশিদো সম্পর্কে যা জান লেখ।

১৬। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) চীনের মুদ্রণশিল্প ; (খ) চা-পান প্রচলন ; (গ) চীনের শিল্পকলা ; (ঘ) সুঙ-বংশের রাজত্বকালে চীনের শিক্ষাপদ্ধতি ; (ঙ) জাপানের মিকাডো ; (চ) নোবুনাগা ; (ছ) হিদেয়োশি ; (জ) ইয়েয়াসু।

১৭। সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন দাও :

(ক) হীনযান/মহাযান বৌদ্ধধর্ম মধ্য-এশিয়া থেকে চীনে প্রচারিত হওয়ার সুযোগ পায়। (খ) তাং/সুঙ রাজবংশের আমলে চীনের সঙ্গে জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। (গ) বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা রাজশক্তি বৃদ্ধির/হ্রাসের বিরোধী ছিলেন। (ঘ) জাপানের সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক/সমাজতান্ত্রিক। (ঙ) চতুর্থ/পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দেই পানীয় হিসাবে চায়ের প্রচলন প্রথম শুরু হয়।

১৮। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) 'বাগানে মধ্যরাত্রি' কার লেখ ? (খ) কোন্ যুগে চীনের মুদ্রণশিল্প খুব উন্নত হয় ? (গ) তাং-রাজাদের রাজধানীর নাম কি ? (ঘ) মার্কো পোলোর জন্ম কোথায় হয় ? (ঙ) জাপানের সম্রাটকে কি বলা হত ? (চ) হারাকিরি কি ?

১৯। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) —খ্রীষ্টাব্দে তাং-রাজবংশের পতন হয়। (খ) হূণদের মতো —যাযাবর। (গ) —থেকে—খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত য়ুয়ান বংশ চীনে রাজত্ব করে। (ঘ) জাপানের সামন্তপ্রথার মূল কথা ছিল প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই—আর প্রত্যেক যোদ্ধাই—। (ঙ) সামুরাইদের ঝগড়াঝাঁটির শেষ নিষ্পত্তি—হত।

একাদশ অধ্যায়

মধ্যযুগে ভারত

১ম পাঠ—গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরবর্তী কাল (৫ম—৭ম শতাব্দী)—হূণ আক্রমণ :

হূণরা ছিল মধ্য-এশিয়ার এক যাযাবর জাতি। গুপ্তবংশের সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে হূণদের আক্রমণ শুরু হয়। প্রথম কুমারগুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্ত বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি যুদ্ধে হূণদের পরাজিত করে ভারতের সীমানা থেকে তাদের

বিতাড়িত করেন। পিতার মৃত্যুর পর স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনের অধিকারী হন। ৪৫৫ থেকে ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। এই সময় হূণরা আবার ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। সম্রাট স্কন্দগুপ্ত হূণদের আক্রমণ থেকে তাঁর রাজ্য রক্ষা করার জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল বিশেষভাবে সুরক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু ৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দে হূণরা গান্ধার জয় করে। ৪৫৮ থেকে ৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হূণজাতি পারস্য ও কাবুল অধিকার করে এবং ভারতের দিকে অগ্রসর হয়। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত-রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। হূণরা তখন গান্ধার থেকে বারবার ভারত আক্রমণ করে এবং কিছুদিনের মধ্যেই পাঞ্জাব, রাজপুতানা, সিন্ধু ও পূর্ব-মালব জয় করে। এই সময় হূণদের নেতা ছিল তোরমান। তোরমান মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করে ভারতে হূণদের অধিকৃত রাজ্য শাসন করতে থাকে। তোরমানের আমলে উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য-ভারতে হূণদের প্রভাব বিস্তৃত হয়।

তোরমানের মৃত্যুর পর তার পুত্র মিহিরগুল সিংহাসন অধিকার করে। পাঞ্জাবের সাকল অথবা শিয়ালকোটে তার রাজধানী ছিল। মিহিরগুল খুব নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী শাসক ছিল। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রজারা মগধের গুপ্ত বংশের রাজা বালাদিত্যের নেতৃত্বে হূণদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বালাদিত্য মিহিরগুলকে পরাজিত ও বন্দী করেন, কিন্তু পরে তাকে মুক্তি দেন। এর পরেও মিহিরগুল প্রজাদের উপর অত্যাচার বন্ধ করেনি। ৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম-মালবের মান্দাসোরের শাসনকর্তা যশোধর্মণ আবার মিহিরগুলকে পরাজিত ও বন্দী করেন। কিন্তু তিনি তাকে মুক্তি দেন। মুক্তি পেয়ে মিহিরগুল কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করে। এবং পরে কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করে। সম্ভবত ৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে মিহিরগুলের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর সঙ্গেই ভারতে হূণ-রাজত্বের অবসান ঘটে। ভারতে বসবাসকারী হূণরা ক্রমে রাজপুতদের সঙ্গে মিলে যায়।

হূণ-আক্রমণের ফলাফল—হূণ-আক্রমণের ফলে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তন দেখা দেয়। হূণ-আক্রমণের ফলেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে ছোট

ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে। বৈদেশিক অনেক জাতিও ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজ্য স্থাপনে সাহসী হয়।

রাজনৈতিক জীবনে যেমন, হূণ-আক্রমণের ফলে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের সামাজিক জীবনেও তেমন পরিবর্তন দেখা দেয়। গুর্জর প্রভৃতি হূণজাতির লোকেরা রাজপুতনার রাজপুতদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে যায় এবং হিন্দুসমাজে ক্ষত্রিয়দের মতো মর্যাদা পেতে থাকে। তবে এই হূণদের আক্রমণের ফলেই হিন্দুসমাজে জাতিভেদ-প্রথা আরও কঠোর হয়ে ওঠে।

২য় পাঠ—গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতন :

সম্রাটদের দুর্বলতা, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ এবং হূণ-আক্রমণ ও অন্যান্য কারণে গুপ্ত-রাজবংশের পতন ঘটে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের ফলে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট হয়ে যায় এবং বিভিন্ন স্থানে নূতন নূতন রাজ্য গড়ে ওঠে। মগধে ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 'পরবর্তী গুপ্ত' নামে পরিচিত একটি রাজবংশ অধিকার স্থাপন করে। মালবও সম্ভবত তাদের অধীনে ছিল। উত্তর-প্রদেশের অযোধ্যা ও আগ্রা অঞ্চলে মৌখরী রাজবংশ রাজত্ব করত। কনৌজ ছিল তাদের রাজধানী। মগধ ও মালবের গুপ্ত-রাজাদের সঙ্গে মৌখরীদের সংঘর্ষ প্রায় সবসময়েই লেগে থাকত। মৌখরী-রাজারা বেশ কয়েকবার হূণ-আক্রমণও প্রতিরোধ করে।

গুপ্তদের পতনের পর মান্দাসোরের শাসনকর্তা যশোধর্মণ হঠাৎ খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তিনি হূণ-রাজ মিহিরগুলকে পরাজিত করেন। তাঁর যুদ্ধ-জয়ের কথা স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি মান্দাসোরে একটি বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। এ স্তম্ভে খোদাই-করা লিপি থেকে জানা যায় যে তিনি ব্রহ্মপুত্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত উত্তর-ভারত জয় করেন। সম্ভবত তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মান্দাসোরের গৌরবময় যুগের অবসান ঘটে। মধ্য-ভারতের বেরার অঞ্চলে বাকাটক রাজবংশও এই সময় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে।

গুপ্তদের পতনের পর সুরাষ্ট্রের বল্লভী অঞ্চলে মৈত্রক রাজবংশ তাদের অধিকার স্থাপন করে। রাজপুতানার বেরোচ ও ভিশমলে গুর্জরদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। পাঞ্জাবে পুষ্যভূতি বংশ রাজত্ব

করত। থানেশ্বর ছিল তাদের রাজধানী। হূণদের সঙ্গে তাদের প্রায় সবসময়ই বিরোধ চলত।

শশাঙ্ক নামে এক ব্যক্তি এই সময় বাংলাদেশে অধিকার স্থাপন করেন। উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানেও শশাঙ্কের রাজনৈতিক প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। ফলে থানেশ্বর ও কনৌজের সঙ্গে তাঁর শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর থানেশ্বর ও বাংলাদেশের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়।

৩য় পাঠ—হর্ষবর্ধন ঃ

থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের রাজাদের মধ্যে প্রভাকরবর্ধন ছিলেন প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা। তিনি গুর্জরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মালব ও গুজরাটে তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়। কনৌজের মৌখরীবংশের রাজা গ্রহবর্মণের সঙ্গে কন্যা রাজ্যশ্রীর বিয়ে দিয়ে প্রভাকরবর্ধন উভয় রাজ্যের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন। এই সময় গৌড় রাজ্যে বাংলাদেশের শাসক ছিলেন শশাঙ্ক। তিনি মালবের রাজা দেবগুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে কনৌজ ও থানেশ্বরের বিরোধিতা শুরু করেন। রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে বসবার পরই মালবের রাজা দেবগুপ্তের হাতে গ্রহবর্মণের পরাজয় ও মৃত্যু এবং রাজ্যশ্রীর বন্দী হওয়ার সংবাদ পান। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যবর্ধন দেব-গুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। দেবগুপ্ত তাঁর কাছে পরাজিত হন। কিন্তু গৌড়রাজ শশাঙ্কের হাতে রাজ্যবর্ধন পরাজিত ও নিহত হন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন সিংহাসনে বসেন এবং ৬০৬ থেকে ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন।

সিংহাসনে বসার সময় হর্ষবর্ধনের বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর। রাজ্যশাসনেও তাঁর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সম্ভবত সেজন্যই সিংহাসন লাভের ছ-বছর পরেও তিনি যুবরাজ শিলাদিত্য নামে পরিচিত ছিলেন। তারপর তাঁর অভিষেক হলে তিনি সম্রাট হর্ষবর্ধন নামে পরিচিত হন।

সিংহাসন লাভের পর হর্ষবর্ধন গৌড়রাজ শশাঙ্ককে দমন করার জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধনের যুদ্ধের ফলাফল ঠিকমতো জানা যায় না। সম্ভবত হর্ষবর্ধন সে-যুদ্ধে

জয়ী হতে পারেননি। এই যুদ্ধের সময়ই তিনি সংবাদ পান যে রাজ্যশ্রী মুক্তিলাভ করে বিন্ধ্য পর্বতের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন।



হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধন এ সংবাদ পাওয়া মাত্রই বোনকে উদ্ধার করতে যান। রাজ্যশ্রী যখন বিন্ধ্য পর্বতের জঙ্গলে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত, সেই সময় হর্ষবর্ধন সেখানে উপস্থিত হয়ে বোনকে বাঁচান। এরপর রাজ্যশ্রীর অনুরোধে হর্ষবর্ধন কনৌজের শাসন-ভারও নেন।

কনৌজ ও থানেশ্বর যুক্ত হওয়ার পর সম্রাট হর্ষবর্ধন রাজ্যবিস্তারে মনোযোগ দেন। একে একে পূর্ব-উড়িষ্যা, বিহার এবং পাঞ্জাব, বাংলাদেশ ও গুজরাটের কিছু অংশ তাঁর অধিকারে আসে। চীনদেশীয় পর্যটক হিউ এন-সাঙও তাঁকে পঞ্চ-ভারতের অধীশ্বর বলে বর্ণনা করেন। আসাম, নেপাল ও সিন্ধু দেশের সঙ্গে তিনি মৈত্রী-সম্পর্ক স্থাপন করেন।

উত্তর-ভারতে আধিপত্য বিস্তারের পর হর্ষবর্ধন ৬২০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-ভারত জয়ের সংকল্প করেন। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে রাজ্য বিস্তার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে তিনি পরাজিত হন এবং নর্মদা নদী উভয় রাজ্যের সীমানা বলে নির্ধারিত হয়। তবে ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বল্লভীরাজ দ্বিতীয় ধ্রুব-সেনকে পরাজিত করেন। আনন্দপুর, কচ্ছ ও দক্ষিণ কাথিওয়াড় তাঁর অধীনতা স্বীকার করে। ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গঞ্জামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধই হর্ষবর্ধনের জীবনের শেষ অভিযান।

গুপ্ত-রাজবংশের আমলে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের মধ্যে রাজ-নৈতিক ঐক্য গড়ে ওঠে। কিন্তু গুপ্তদের পতনের পর এই ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়। হর্ষবর্ধন আবার উত্তর-ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলেন। কিন্তু চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে পরাজিত হওয়ার ফলে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

সম্রাট হিসেবে প্রজাদের কল্যাণসাধনকেই হর্ষবর্ধন তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত বলে মনে করতেন। তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির

জন্যও খুব চেষ্টা করেন। তাঁর চেষ্টার ফলেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। তিনি জ্ঞানী ও গুণীর সমাদর করতেন। হর্ষ-চরিত ও কাদম্বরীর রচয়িতা কবি বাণভট্ট তাঁর সভাকবি ছিলেন। হর্ষবর্ধন নিজেও প্রিয়দর্শিকা, রত্নাবলী ও নাগানন্দ নামে তিনটি নাটক লেখেন। চীনা-পর্যটক হিউ এন-সাঙের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়। তাঁর কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। ফলে তাঁর মৃত্যুর পরই থানেশ্বর রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। হর্ষবর্ধনই হিন্দুযুগে ভারতের শেষ উল্লেখযোগ্য সম্রাট।

৪র্থ পাঠ—হিউ এন-সাঙের ভারতভ্রমণের বিবরণ ঃ

চীনা পরিব্রাজক হিউ এন-সাঙ ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রবেশ করেন। ১৩ বছর ভারতে বাস করার পর তিনি দেশে ফিরে যান। সম্রাট হর্ষবর্ধনের আমলে তিনি কনৌজ, থানেশ্বর, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে দীর্ঘকাল বাস করেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তক্ষশীলার বিদ্যাপীঠেও তিনি দুবার যান। সারনাথ, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মের তীর্থস্থানগুলিও তিনি দর্শন করেন। উত্তর-ভারতের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য স্থান পরিদর্শন করে তিনি দক্ষিণ-ভারতে যান। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বসবাসের সময় তিনি নানারূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এইসব অভিজ্ঞতার একটি দিনলিপি তিনি লিখে রাখেন।

হিউ এন-সাঙের বিবরণ—হর্ষবর্ধনের আমলের উন্নত ধরনের শাসন-পদ্ধতি দেখে হিউ এন-সাঙ মুগ্ধ হন। শাসনকার্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই হর্ষবর্ধন নিজে সতর্ক দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করতেন। এই উদ্দেশ্যে বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তিনি প্রায়ই ঘুরে বেড়াতেন। শাসনকার্যে সম্রাটকে সাহায্য করার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকত। শাসনের সুবিধার জন্য হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য দুটি প্রদেশ বা ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। প্রদেশগুলি আবার জেলা বা বিষয়, তহশিল বা পাঠক ও গ্রামে বিভক্ত ছিল। সুষ্ঠুভাবে শাসনের কাজ চালানোর জন্য মহাসামন্ত, মহারাজা, কুমার-অমাত্য, বিষয়পতি প্রভৃতি রাজ-কর্মচারী নিয়োগ করা হত। গ্রামের শাসনকর্তাকে গ্রামিক বলা হত। তাকে সাহায্য করার জন্য আরও কয়েকজন কর্মচারী নিযুক্ত করা হত।

প্রজাদের মঙ্গলসাধন করাই ছিল হর্ষবর্ধনের শাসন-নীতির মূল লক্ষ্য। ভূমি-রাজস্ব ও শুল্কই ছিল রাষ্ট্রের প্রধান আয়। কিন্তু প্রজাদের খুব কম পরিমাণই কর দিতে হত। জমিতে উৎপন্ন শস্যের ছ-ভাগের একভাগ কর হিসেবে আদায় করা হত।

দেশে অপরাধীর সংখ্যা খুব কম ছিল। অপরাধীর কঠোর শাস্তি হত। বিশেষ বিশেষ অপরাধে অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদ, রাজ্য থেকে অপরাধীকে বিতাড়ন এবং জরিমানা আদায় করা হত। আগুন, জল প্রভৃতির দ্বারাও অপরাধীর বিচারের ব্যবস্থা ছিল।

হর্ষবর্ধন প্রথম জীবনে শিবের উপাসক ছিলেন। পরে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন। তবে সকল ধর্মের প্রতিই তিনি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তিনি বহুস্থানে অনেক স্তূপ ও মঠ নির্মাণ করেন। তখন থেকে তিনি তাঁর রাজ্যে পশুবধ নিষিদ্ধ করেন। পশুবধের জন্য কখনও কখনও অপরাধীকে প্রাণদণ্ডও দেওয়া হত।

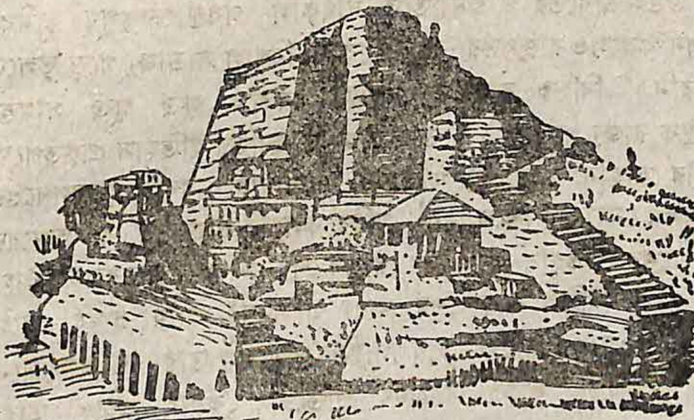
হিউ এন-সাঙের সম্মানে হর্ষবর্ধন কনৌজে এক বৌদ্ধ ধর্মসভার আয়োজন করেন। ঐ সম্মেলনে আঠার জন রাজা উপস্থিত ছিলেন। কনৌজের ধর্মসভার পর হর্ষবর্ধন প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে একটি মেলার ব্যবস্থা করেন। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই মেলা বসত। হিউ এন-সাঙ এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক রাজা ঐ মেলায় যোগ দেন। ঐ মেলায় সব টাকা-পয়সা-ধন-রত্ন দান করে সম্রাট হর্ষবর্ধন একটিমাত্র বস্ত্র সম্বল করে রাজধানীতে ফিরে যেতেন। প্রয়াগের ঐ মেলায় বুদ্ধদেবের উপাসনাই প্রাধান্য পেত। তবে সূর্য ও শিবের পূজাও হত। বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সাধু-সন্ন্যাসী সেখানে দান গ্রহণ করতেন।

৫ম পাঠ—নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান বিহারের পাটনা জেলায় নালন্দা অবস্থিত। প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগৃহের (বর্তমান রাজগীর) কাছেই ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। অনেকে মনে করেন যে গুপ্ত-রাজাদের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়।

হিউ এন-সাঙ কয়েক বছর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা ছিল দশ হাজার। হিউ এন-সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় যে ধর্মশাস্ত্র ছাড়াও রসায়ন, গণিত,

আয়ুর্বেদ, ন্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হত। মহাযান বৌদ্ধ দর্শন পড়াবারও বিশেষ ব্যবস্থা এখানে ছিল। ছাত্রদের কোন বেতন দিতে হত না। রাজা ও ধনী ব্যক্তিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত খরচ বহন করতেন। হিউ এন-সাঙের সময় শীলভদ্র নামে এক বাঙালী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন। বিশ্ব-



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

বিদ্যালয়ে একটি বেশ বড় গ্রন্থাগার ছিল। মুসলমানদের ভারত-আক্রমণের সময়েও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিদেশী আক্রমণে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়।

সম্রাট হর্ষবর্ধনের পরবর্তী যুগ (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী)

৬ষ্ঠ পাঠ—রাজপুত ঃ

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর কনৌজ-থানেশ্বরের সাম্রাজ্যের পতন হয়। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গড়ে ওঠে। এইসব রাজ্যের অনেকগুলোই ছিল রাজপুত জাতির রাজ্য।

রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতরা একমত নন। অনেকের মতে কুষাণ, শক, হূণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির সঙ্গে ভারতীয়দের মিলনের ফলে রাজপুত জাতির উৎপত্তি। রাজপুতদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে এখনও কিছু কিছু বিদেশী রীতি-নীতির প্রচলন আছে। অগ্নি-উপাসনা প্রভৃতি কয়েকটি ধর্মীয় নীতি হূণ বা

শকদের মতো। তাদের চেহারায়ও বিদেশী প্রভাব স্পষ্ট। শক্তিশালী গোষ্ঠী-প্রধানরাই প্রথমে রাজপুত নামে এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষ জাঠ, গর্জর, আহির প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। পরে এইসব জাতি-গোষ্ঠীর সকলেই রাজপুত নামে পরিচিত হয়।

উত্তর-ভারতের রাজনীতিতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও রাজপুতরা কখনও কোন বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারেনি। বিভিন্ন রাজপুত গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত-তান্ত্রিক রাজ্য গড়ে ওঠে। তাই রাজপুত জাতির ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে দিল্লীর চৌহান, কনৌজের প্রতিহার, মালোয়ার পারমার, বুন্দেলখণ্ডের চান্দেলা, মেবারের শিশোদিয়া, চেদির কলচুরি ও জয়পুর বা অম্বরের রাজবংশের ইতিহাস। এইসব রাজবংশের মধ্যে কোনরকম ঐক্য ছিল না। বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে সবসময়ই প্রায় সংঘর্ষ লেগে থাকত। দেশের স্বার্থের চেয়ে গোষ্ঠীর স্বার্থকেই তারা বড় বলে মনে করত। বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যও তারা একযোগে কোন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। মুসলমানদের আক্রমণের সময় রাজপুতদের এই দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। আত্মকলহের ফলেই দিল্লীর চৌহান ও কনৌজের গহরবাল রাজবংশের পতন ঘটে।

৭ম পাঠ – প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট সংঘর্ষ ঃ

রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশে প্রায় একশ বছর ধরে দারুণ অরাজকতা চলে। শক্তিমানদের অত্যাচারে দুর্বলের জীবন অসহ্য হয়ে ওঠে। নানা বিদেশী জাতিও এই সময়ে বঙ্গদেশ আক্রমণ করে। এই অনিশ্চিত ও অরাজক অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা গোপাল নামে এক প্রভাবশালী সামন্তকে বঙ্গদেশের রাজা নির্বাচিত করেন। সম্ভবত ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল বঙ্গদেশের রাজা হন। তাঁর সুশাসনে রাজ্যে শান্তি ফিরে আসে।

গোপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ধর্মপাল পালবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর আমলে বিহারেও পালদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। উত্তর-ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের উপর তিনি আধিপত্য বিস্তার করতে চেষ্টা করেন।

ফলে মালবের প্রতিহার রাজবংশ ও দক্ষিণ-ভারতের রাষ্ট্রকূট বংশের সঙ্গে পালরাজবংশের সংঘর্ষ শুরু হয়।

মধ্যযুগে ভারতের ইতিহাসে কনৌজ সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভ করে। পাল, প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূট—এই তিন রাজবংশের রাজারাই কনৌজ অধিকার করে উত্তর-ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। মগধ বা বিহার অধিকার করার পর রাজা ধর্মপালের রাজ্য পশ্চিমে এলাহাবাদ পর্যন্ত হয়। এবার তিনি আরও পশ্চিম দিকে এগিয়ে কনৌজ অধিকার করতে প্রস্তুত হন। অপর দিকে মালবের প্রতিহার-রাজ বৎসরাজ পূর্বদিকে সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করে কনৌজ অধিকার করতে চেষ্টা করেন। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবও উত্তর দিকে সাম্রাজ্য বিস্তৃত করে কনৌজ অধিকার করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। তিন রাজবংশের এই সংঘর্ষের প্রথম দিকে গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলে ধর্মপালের সঙ্গে বৎসরাজের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বৎসরাজ ধ্রুবের নিকট পরাজিত হয়ে রাজপুতানার মরু অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এরপর ধ্রুব ধর্মপালকেও পরাজিত করেন। এই যুদ্ধের পরই ধ্রুবকে দক্ষিণ-ভারতে ফিরে যেতে হয় এবং সেই সুযোগে ধর্মপাল আবার উত্তর-ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন। ধর্মপাল কনৌজের রাজা ইন্দ্ররাজকে বিতাড়িত করে তাঁর অনুগত চক্রায়ুধকে কনৌজের রাজা বলে ঘোষণা করেন। চক্রায়ুধের অভিষেকের সময় ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার ও কির রাজ্যের রাজারা উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ই উত্তর-ভারতে পাল-রাজবংশের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও আধিপত্য সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হয়।

উত্তর-ভারতের ধর্মপালের এই রাজনৈতিক প্রভাব কিন্তু বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট সিন্ধু, বিদর্ভ, কলিঙ্গ, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যের রাজাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ধর্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ফলে পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের কনৌজ অধিকার নিয়ে দ্বিতীয়বার সংঘর্ষ শুরু হয়। দ্বিতীয় নাগভট্ট ধর্মপালের অনুগত চক্রায়ুধকে পরাজিত করে কনৌজ অধিকার করেন। তারপর তিনি ধর্মপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। মুঙ্গেরের কাছে ধর্মপাল দ্বিতীয় নাগভট্টের হাতে ভীষণভাবে পরাজিত হন।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ ধর্মপালকে সাহায্য করার জন্য উত্তর-ভারতে এসে উপস্থিত হন। ধর্মপাল তৃতীয় গোবিন্দের আনুগত্য স্বীকার করলে তিনি দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করে ধর্মপালকে বিপদ-মুক্ত করেন। যুদ্ধে জয়লাভের অল্পদিনের মধ্যেই তৃতীয় গোবিন্দ দক্ষিণ-ভারতে ফিরে গেলে ধর্মপাল আবার তাঁর ক্ষমতা বিস্তার করার সুযোগ পান।

৮ম পাঠ—উত্তর-ভারতের অন্যান্য রাজ্য :

সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর-ভারতে মালব ও বঙ্গদেশ রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করে। তবে এই দুটি রাজ্য ছাড়াও উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট অনেক রাজ্য গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে গুর্জর, ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার, কির, আজমীর, দিল্লী, বুন্দেলখণ্ড, কলিঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যের নাম উল্লেখ করা যায়। রাজনৈতিক শক্তির উত্থান-পতন অনুযায়ী এইসব রাজ্য শক্তিশালী রাজাদের আনুগত্য স্বীকার করত। সাধারণভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলো পাল রাজবংশের এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলো প্রতিহারদের অনুগত ছিল।

বঙ্গদেশ

৯ম পাঠ—শশাঙ্ক :

শশাঙ্কই গৌড়রাজ্যের বা বঙ্গদেশের প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা। তাঁর বংশ-পরিচয় অথবা বাল্যজীবন সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। অনেকে মনে করেন যে, শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্রগুপ্ত এবং তিনি গুপ্তরাজবংশেই জন্মগ্রহণ করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে তিনি প্রথম জীবনে গুপ্তদের অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন।

পরবর্তী গুপ্তরাজবংশের পতনের পর আনুমানিক ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই শশাঙ্ক বঙ্গদেশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন।

শশাঙ্ক দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর জেলা), উৎকল (উত্তর উড়িষ্যা) ও কঙ্গোদ (দক্ষিণ উড়িষ্যা) জয় করেন। সম্ভবত তিনি পূর্ববাংলাও জয় করেন। পশ্চিমে মগধরাজ্যেও শশাঙ্কের অধিকার স্থাপিত হয়। শশাঙ্কের পূর্বে আর কোন বাঙ্গালী এত বড় রাজ্য গড়ে তুলতে পারেননি। পরবর্তীকালে তিনি বারাণসী জয় করে গৌড়ের চিরশত্রু মৌখরীদের দমন করতে প্রস্তুত হন। সেই উদ্দেশ্যে

তিনি মালবের রাজা দেবগুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে মৌখরীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। মৌখরীদের আত্মীয় রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। দেবগুপ্ত রাজ্যবর্ধনের কাছে পরাজিত হন। কিন্তু রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন সিংহাসনে বসার পর শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু সম্ভবত তিনি শশাঙ্ককে যুদ্ধে পরাজিত করতে ব্যর্থ হন। কারণ ৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে—তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত শশাঙ্ক স্বাধীনভাবে গৌড়রাজ্য শাসন করেন।

রাজা শশাঙ্কের রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি গ্রামের কাছে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

শশাঙ্ক শিবের উপাসক ছিলেন। হিউ এন-সাঙ বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে শশাঙ্কের অত্যাচারের অনেক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেসব কাহিনী বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ হিউ এন-সাঙের বিবরণ থেকেই জানা যায় যে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ও তাঁর রাজ্যের অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধধর্ম তখনও বিস্তার লাভ করছিল। শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মের শত্রু হলে তা কখনও হতে পারত না।

১০ম পাঠ—পাল ও সেন রাজাদের আমলে বঙ্গদেশের সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষা :

প্রায় চার-শ বছর ধরে পাল-বংশ বাংলাদেশে রাজত্ব করে। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় এক-শ বছর ধরে বঙ্গদেশে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা চলছিল। পালরাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। দেশে রাজনৈতিক শান্তি স্থাপিত হওয়ার পরে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও গড়ে ওঠে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতির ক্ষেত্রেও খুব উন্নতি দেখা দেয়। সেন-বংশের আমলেও এই উন্নতি অব্যাহত থাকে।

সে-যুগে বঙ্গদেশের লোকেদের সামাজিক আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি প্রায় আধুনিক বাঙালীদের মতোই ছিল। খাওয়া-দাওয়াতেও আধুনিক যুগের বাঙ্গালীদের সঙ্গে তাদের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। সে-যুগের বাঙ্গালীরা ভাত, ডাল, তরকারি, মাছ, মাংস, দুধ, ঘি, ছানা, দুগ্ধজাতীয় নানারকম খাদ্য, পিঠে-পায়েস প্রভৃতি

খেতে ভালবাসত। আধুনিক যুগের বাঙালীদের মতোই তারা কার্পাস-তুলা ও রেশমের তৈরি পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করত। দেশে খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য ছিল। সাধারণ মানুষের জীবন বেশ সুখে শান্তিতে কাটত। সমাজে জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত থাকলেও এই প্রথার কঠোরতা ছিল না। সম্ভবত যোগ্যতাই ছিল সরকারী চাকরিতে নির্বাচনের মাপকাঠি। পালদের সময় কৈবর্তদের জাগরণ থেকে সেইরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পাল ও সেন—এই দুই রাজবংশই শিক্ষানুরাগী ছিলেন। ফলে পাল ও সেন-যুগের লোকেরা লেখা-পড়া শেখার সুযোগ পেত।

সেন-রাজগণ বাংলাদেশের সমাজের কিছু কিছু সংস্কার করেন। এইসব সংস্কারের মধ্যে কৌলীন্য-প্রথার প্রচলন সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। হিন্দুসমাজকে নূতনভাবে গঠন করার জন্য রাজা বল্লাল-সেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ—এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তন করেন। সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে কুলীন শ্রেণীর লোকদের কয়েকটি বিশেষ নিয়ম মেনে চলতে হত। আচার-ব্যবহার, পাণ্ডিত্য, চরিত্রের পবিত্রতা প্রভৃতি নানা প্রকারের গুণের বিকাশই ছিল এইসকল প্রথার মূল উদ্দেশ্য।

ধর্ম—পাল-রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন এবং এই সময়ে একমাত্র বাংলাদেশেই বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু অন্য ধর্ম সম্পর্কেও তাঁরা উদার ছিলেন। তবে এই যুগে বৌদ্ধধর্মের অনেক পরিবর্তন হয় এবং মহাযানের পরিবর্তে সহজযান বা সহজিয়া মতবাদ প্রসার লাভ করে। সহজিয়া মতবাদের উপর এই সময় অনেক বই লেখা হয় এবং তাদের অধিকাংশের লেখকই বাঙালী। পালদের আমলেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিব্বতে যান।

সেন-রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান হয়। তাঁরা তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের প্রচারের জন্য মগধ, চট্টগ্রাম, আরাকান, উড়িষ্যা ও নেপালে ধর্মপ্রচারক পাঠান। ধর্মের জন্য তাঁরা সামাজিক প্রথারও সংস্কার করেন। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানে যে শিথিলতা দেখা দেয় সেসব দূর করার জন্য তাঁরা চেষ্টা করেন। তবে অন্যান্য ধর্মমতের ক্ষেত্রেও তাঁরা উদার মনোভাবের পরিচয় দেন।

শিক্ষা—পাল ও সেন-রাজারা শিক্ষানুরাগী ছিলেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁরা উপযুক্ত অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পালদের আমলেই বিক্রমশীলা বিহার ও ওদন্তপুরী বিহার স্থাপিত হয়। পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপাল বিক্রমশীলা বিহার স্থাপন করেন। নালন্দার মতো বিক্রমশীলা বিহারও ভারতে এবং ভারতের বাইরে খ্যাতি লাভ করে। গঙ্গাতীরে এক পাহাড়ের উপর এই বিহারে একটি মন্দির ও তার চারদিকে ১০৭টি ছোট ছোট মন্দির ছিল। ১১৪ জন শিক্ষক এখানে নানা বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন। তিব্বত থেকে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু এখানে শিক্ষালাভ করতে আসতেন। বিক্রমশীলা বিহারের আচার্য বা ব্রহ্মাচার্য ছিলেন ভিক্ষু জ্ঞানপাদ। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অতীশ), কমলশীল, প্রভাকর, কল্যাণ রক্ষিত প্রভৃতি পণ্ডিত এখানে অধ্যাপনা করতেন। শিক্ষালাভ করার জন্য ছাত্রদের কোন অর্থব্যয় করতে হত না।

পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল ওদন্তপুরী বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেন। প্রসিদ্ধ বাঙালী বৌদ্ধপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ওদন্তপুরী বিহারে শিক্ষালাভ করেন। এখানে মেধাবী ছাত্রদের বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হত। ওদন্তপুরী বিহার পাল-যুগের স্থাপত্যশিল্পেরও এক অপূর্ব নিদর্শন।

সেন-রাজবংশের রাজারাও শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই বংশের অন্যতম রাজা বল্লালসেন নিজে কবি ছিলেন। তিনি অদ্ভুতসাগর ও দানসাগর নামে দু-খানা গ্রন্থ রচনা করেন। গীতগোবিন্দ-রচয়িতা কবি জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন।

১১শ পাঠ—দক্ষিণ-ভারত—বাদামির চালুক্য ও কাঞ্চীর পল্লব রাজবংশ :

বাদামির চালুক্য—ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বর্তমান কর্নাটক অঞ্চলে বাতাপি বা বাদামিকে কেন্দ্র করে চালুক্যদের রাজ্য গড়ে ওঠে। এই রাজবংশ বাদামির চালুক্যবংশ নামে পরিচিত। চালুক্য বংশের প্রথম রাজা জয়সিংহ বল্লভ। এই বংশের তৃতীয় রাজা প্রথম পুলকেশী খুব শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তিনি ৫৩৫ থেকে ৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র কীর্তিবর্মার সঙ্গে দক্ষিণ কোঙ্কণের মৌর্যদের যুদ্ধ হয়।

কীর্তিবর্মার পর সিংহাসনে বসেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মঙ্গলেশ। তিনি ৫৯৮ থেকে ৬১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি মহারাষ্ট্র পর্যন্ত চালুক্যদের আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁকে হত্যা করে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর রাজত্বকালে উত্তরে গুজরাটের দক্ষিণ অঞ্চল, পশ্চিমে কোঙ্কণ এবং দক্ষিণে বেঙ্গী পর্যন্ত চালুক্য-রাজ্য বিস্তৃত হয়। থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধনের দক্ষিণ-ভারতের অভিযান তিনি ব্যর্থ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পুলকেশীর এই রাজনৈতিক আধিপত্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহ দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত করেন। চালুক্য রাজ্যের রাজধানী বাদামিও তিনি অধিকার করেন। দ্বিতীয় পুলকেশীই বাদামির চালুক্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর রাজত্বকালেই চীনা পরিব্রাজক হিউ এন-সাঙ চালুক্য রাজ্যে ভ্রমণ করেন এবং দ্বিতীয় পুলকেশীর শাসন-দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হন। তারপর চালুক্য ও পল্লবদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সংঘর্ষ চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পলবদের বিতাড়িত করে বাদামি উদ্ধার করেন। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য চালুক্য বংশের শেষ শক্তিশালী রাজা। তিনি ৭৩৩ থেকে ৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কীর্তিবর্মার রাজত্বকালে ৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গ চালুক্য রাজ্য অধিকার করলে বাদামির চালুক্যদের রাজত্বের অবসান হয়।

১২শ পাঠ—চালুক্যদের শিল্পকলা ও স্থাপত্য ঃ

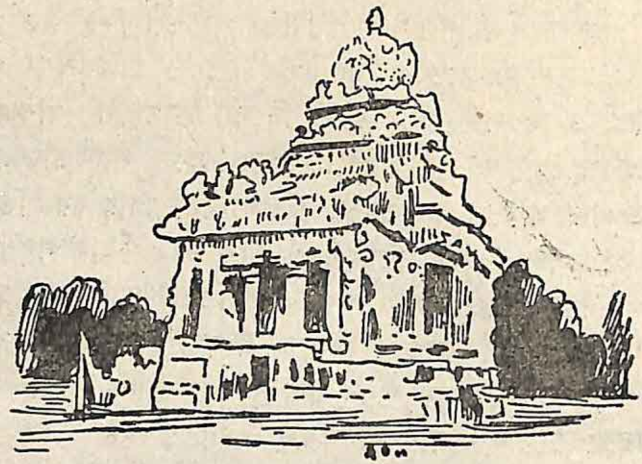
চালুক্য রাজারা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁদের সময়ে অনেক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মন্দির তৈরি হয়। চালুক্যদের রাজ্যের মধ্যেই অজন্তা ও ইলোরা অবস্থিত। অজন্তা ও ইলোরার অনেক গুহাচিত্র চালুক্যদের আমলে আঁকা হয়। রাজা মঙ্গলেশ বাদামির বিখ্যাত শিবমন্দিরটি নির্মাণ করেন। তাঁদের আমলে পাহাড় কেটে কয়েকটি মন্দির তৈরি হয়। একটি মন্দিরের গায়ে কবি রবিকীর্তির রচিত দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রশস্তি খোদিত আছে। বিজাপুর জেলার পত্তকদলের বিষ্ণুমন্দির ও আইহোলের বিষ্ণুমন্দির চালুক্যদের ভাস্কর্যের সবচেয়ে সুন্দর দৃষ্টান্ত।

কাঞ্চীর পল্লব রাজবংশ—ষষ্ঠশতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দক্ষিণ-ভারতে পল্লব-রাজবংশ রাজত্ব করত। বর্তমান তামিলনাড়ু, আর্কট, ত্রিচিনাপল্লী ও তাঞ্জোর পল্লব রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পল্লবদের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত পোষণ করেন। অনেকের মতে পল্লবরা কোন বিদেশী রাজবংশ। কাঞ্চীর পল্লবদের প্রথম শক্তিশালী রাজা ছিলেন বিষ্ণুগোপ। কিন্তু বিষ্ণু-গোপের পর প্রায় আড়াই-শ বছরের মধ্যে কোন পল্লব-রাজার কথা জানতে পারা যায় না। পরবর্তী পল্লব-শাসনের গৌরবময় ইতিহাসের সূচনা করেন সিংহবিষ্ণু। তিনি ৫৭৬ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি চের, চোল ও পাণ্ড্য—এই তিনটি তামিল রাজ্য জয় করেন। তিনি সিংহলেও (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) অভিযান করেন। সিংহবিষ্ণুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র মহেন্দ্রবর্মণ। তিনি সম্ভবত চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে পরাজিত হন। তবে দ্বিতীয় পুলকেশী পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চী জয় করতে পারেননি।

মহেন্দ্রবর্মণের পুত্র নরসিংহবর্মণ পল্লব-রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি ৬২৫ থেকে ৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত করে তাদের রাজধানী বাদামি অধিকার করেন। তাঁর রাজত্বকালে চীনা পর্যটক হিউ এন-সাঙ কাঞ্চী যান। নরসিংহবর্মণের মৃত্যুর পর পল্লব-রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে পল্লব-বংশের শেষ রাজা অপরাজিত-বর্মণকে পরাজিত ও নিহত করে চোলরাজ আদিত্য পল্লব-রাজ্য অধিকার করেন।

পল্লবদের শিল্প ও স্থাপত্য—দক্ষিণ-ভারতের রাজবংশগুলির মধ্যে পল্লবরাই শিল্প ও স্থাপত্যের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত। দক্ষিণ-ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যশিল্প নির্মাণের কৃতিত্ব পল্লবদের। রাজা মহেন্দ্রবর্মণ দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ-ভারতের শিল্পরীতিতে তাঁর দান অসামান্য। পাথর কেটে মন্দির নির্মাণের পদ্ধতি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত হয়। চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি শিল্পকলাও মহেন্দ্রবর্মণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

নরসিংহবর্মণও বহু মন্দির তৈরি করান। তিনি মহাবলীপুরম নগরীর পত্তন করেন। মহাবলীপুরমের রথ-শিল্প পল্লব-যুগের শিল্পের



দক্ষিণ-ভারতের মন্দির

এক বিশিষ্ট নিদর্শন। কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দির ও বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির পল্লব-স্থাপত্যের অপূর্ব সৃষ্টি।

চোল-রাজবংশের সামুদ্রিক অভিযান—দক্ষিণ-ভারতের চোল-রাজবংশের রাজত্বকালে ভারতের বাইরের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয়। ব্রহ্মদেশ, সিংহল (শ্রীলঙ্কা), ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপ এবং মালয় উপদ্বীপের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কাবেরী নদীর মোহনায় কাবেরীপতনম খুব গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্য-বন্দর। এই বন্দরের সাহায্যে বিদেশীদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হত।

সামুদ্রিক বাণিজ্যকে নিরাপদ করার জন্য চোলরাজারা বিশাল এক নৌ-বাহিনী তৈরি করতে বাধ্য হন। এই নৌ-বাহিনীর সাহায্যে বাইরের দেশেও চোলরাজারা তাঁদের আধিপত্য স্থাপন করেন। চোল-নরপতি রাজরাজ চের রাজাদের নৌ-বাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করে নৌশক্তিতে চোলদের প্রাধান্য স্থাপন করেন। নৌ-শক্তির সাহায্যে তিনি মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপ জয় করেন। চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্র সিংহল (শ্রীলঙ্কা) জয় করেন। নৌ-শক্তির

সাহায্যে তিনি কিছুকালের জন্য সুমাত্রা এবং মালয় উপদ্বীপের উপরও চোলদের আধিপত্য স্থাপন করেন।

মনে রাখবে

১. গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পর মধ্য-এশিয়ার যাযাবর হূণ জাতি বারবার ভারত আক্রমণ করতে থাকে এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বেশ কিছু অংশ জয় করে নেয়। ক্রমে হূণজাতি রাজপুতদের সঙ্গে মিশে যায়, অন্যদিকে হিন্দুসমাজের জাতিভেদ-প্রথার কঠোরতাও বেড়ে যায়।

২. সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময়ে আবার ভারতে শক্তিশালী হিন্দু-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর আধিপত্য প্রধানত উত্তর-ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউ এন-সাঙ তাঁর রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসেন। তাঁর বিবরণ থেকে সেকালের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রায় সবরকমের তথ্যই জানা যায়। প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগৃহের কাছে সেকালের বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত ছিল। রসায়ন, গণিত, আয়ুর্বেদ, ন্যায়, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে পাঠদানের ব্যবস্থা এখানে ছিল।

৩. হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য ভেঙ্গে যায় এবং অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে অনেকগুলিই ছিল রাজপুত-রাজ্য, কিন্তু অনেকেই ছিল স্ব-স্ব প্রধান।

৫. উত্তর-ভারতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে মালবের প্রতিহার বংশ, দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট-বংশ ও বঙ্গদেশের পাল-বংশের রাজাদের মধ্যে বিরোধ-সংঘর্ষ চলে। কেউই একাধিপত্য বিস্তার করতে পারেননি।

৫. গৌড়রাজ্য বা বঙ্গদেশের প্রথম স্বাধীন রাজা হলেন শশাঙ্ক। উৎকল, মগধ, বারাণসী প্রভৃতি অঞ্চল জয় করে তিনি তাঁর রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে তোলেন। সম্ভবত সম্রাট হর্ষবর্ধনও তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারেননি।

৬. শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় একশ বছর কাল বঙ্গদেশে অরাজকতা চলে। এরপর পাল-রাজাদের আমলে দেশে আবার শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও উন্নতি ঘটে। পাল-রাজারা ছিলেন ধর্মে বৌদ্ধ। এই বংশের বিখ্যাত রাজা হলেন ধর্মপাল।

৭. পাল-রাজত্বের পরে সেন-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা। এঁদের আমলেও সব দিকে উন্নতি ঘটে। এঁরা ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক। সেন-বংশের অন্যতম প্রধান রাজা ছিলেন বল্লালসেন। ইনি হিন্দুসমাজে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তন করেন। বিখ্যাত ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যের রচয়িতা কবি জয়দেব ছিলেন রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি।

৮. মধ্যযুগের দক্ষিণ-ভারতের দুটি প্রধান রাজবংশ হল—বাদামির চালুক্য ও কাঞ্চীর পল্লব-রাজবংশ। দুটি রাজবংশই ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ৮ম

শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করে। দ্বিতীয় পুলকেশী ছিলেন চালুক্য রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা, আর নরসিংহবর্মণ পল্লব-রাজবংশের। শিল্পে স্থাপত্যে দুটি রাজবংশেরই উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

৯. দক্ষিণ ভারতের আর-একটি শক্তিশালী রাজবংশ হল চোল-রাজবংশ। এঁদের আমলে ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতের জলপথে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শক্তিশালী নৌ-বাহিনীর সাহায্যে এঁরা বাইরের দেশেও আধিপত্য বিস্তার করেন।

অনুশীলনী

১। হূণরা কখন ভারত আক্রমণ করে? কোন্ কোন্ অঞ্চলে হূণরা কর্তৃত্ব স্থাপন করে? ভারতে হূণদের রাজনৈতিক ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। হূণদের আক্রমণে ভারতের রাজনীতিতে কি পরিবর্তন দেখা দেয়? হূণ-আক্রমণের ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। কিভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে?

৪। সম্রাট হর্ষবর্ধনের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫। হিউ এন-সাঙের বিবরণ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যা জান লেখ।

৭। সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

৮। পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূটদের সংঘর্ষের কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৯। রাজা শশাঙ্কের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১০। পাল ও সেনবংশের আমলে বঙ্গদেশের সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কি জান?

১১। চালুক্য রাজবংশের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১২। পল্লব রাজবংশের রাজনৈতিক ও স্থাপত্য-শিল্পের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১৩। সংক্ষেপে উত্তর দাও:

(ক) চোল রাজবংশের সামুদ্রিক অভিযান সম্পর্কে যা জান লেখ। (খ) রাজা প্রভাকরবর্ধন ও রাজা রাজ্যবর্ধনের সম্বন্ধে কি জান? (গ) হিউ এন-সাঙ কোন্ পথে ভারতে আসেন? তিনি ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে ভ্রমণ করেন? (ঘ) কনৌজের বৌদ্ধধর্মসভা ও প্রয়াগের মেলা সম্পর্কে যা জান লেখ। (ঙ) রাজপুতজাতি সম্পর্কে যা জান লেখ। তাদের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য কি?

১৪। এক কথায় উত্তর দাও:

(ক) যশোধর্মণ কে? (খ) মিহিরগুলের রাজধানী কোথায় ছিল?

(গ) দেবগুপ্ত কে ? (ঘ) রাজ্যশ্রী কে ? (ঙ) কাদম্বরীর লেখক কে ? (চ) হর্ষচরিত্রের লেখক কে ? (ছ) রত্নাবলীর লেখক কে ? (জ) পুলকেশী কোথাকার রাজা ছিলেন ? (ঝ) কৌলীন্য-প্রথা কে প্রবর্ত্তন করেন ? (ঞ) পল্লব রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ?

১৫। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :

(ক) রাজা গোপাল ; (খ) রাজা ধর্মপাল ; (গ) বিক্রমশীলা বিহার ; (ঘ) মহাবলীপুরম ; দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

১৬। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) তোরমানের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র—সিংহাসন অধিকার করে। (খ) সিংহাসনে আরোহণের পর হর্ষবর্ধন গৌড়রাজ—দমন করার জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন। (গ) —সম্মানে হর্ষবর্ধন—এক বৌদ্ধধর্ম-সভার আয়োজন করেন। (ঘ) গোপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র —৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। (চ) পাল ও সেন রাজারা—ছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক

১ম পাঠ—স্থলপথে মধ্য-এশিয়া ও চীনে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার :

কুষাণ-রাজবংশের রাজত্বকালে মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে পঠে। কুষাণ-বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কণিষ্কের আমলে কুষাণ-সাম্রাজ্য মধ্য-এশিয়ার খোটান ও খোরাসান থেকে পূর্বে বিহার ও দক্ষিণে উজ্জয়িনী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। সম্রাট কণিষ্ক নিজে মহাযান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে আর সেখানে অনেক ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এইসব উপ-নিবেশের মধ্যে শৈলদেশ (কাশগড়), শো-খিউ অথবা চোক্কুক (ইয়ারখন্দ), খোতান্ন (খোটান), দৌমোকো, নিয়, দণ্ডান-অয়লিক, ত্রন্দেরে, কুচি (বর্তমান কুচ), ইয়েন-চি অথবা ইয়েন কি (বর্তমান কারা শহর), তুরফান প্রভৃতি উপনিবেশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসব স্থানে মহাযান বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে।

ভারতীয় শিল্পের আদর্শে নির্মিত বহু স্তূপ ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ এইসব অঞ্চলে এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

মধ্য-এশিয়ার পথেই ভারতের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের আদান-প্রদান শুরু হয়। মধ্য-এশিয়ার পথেই বৌদ্ধধর্মও চীনে প্রবেশ করে। হান-রাজবংশের সম্রাট মিংতির আমন্ত্রণে মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কাশ্যপ মাতঙ্গ ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য চীনে যান। তিনি প্রায় সাত বছর ধরে চীনদেশের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্মের মহাযান মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর প্রচারের ফলেই বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং বহু লোক এই ধর্মমত গ্রহণ করতে শুরু করে। লো-ইয়াং শহরে এই সময় একটি বৌদ্ধমঠও নির্মিত হয়। পরবর্তী কালে ভারতের বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ধর্মপ্রচারের জন্য চীনদেশে গমন করেন। চীনদেশের বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীও বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শন করার জন্য ভারতে আসেন। বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করার জন্য চীনদেশের অনেকে নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়েও এসে উপস্থিত হতেন। ভারতের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এইযুগে চীনদেশে বেড়াতে যান। তাঁদের মধ্যে কুমারজীবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। ৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনদেশে যান এবং চীনদেশ সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। ৩৫৭ থেকে ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে চীনদেশে বেশ কয়েকবার রাষ্ট্রদূত ও ধর্মপ্রচারক পাঠানো হয়। তবে ভারতের সঙ্গে চীনের রাজনৈতিক সম্পর্ক অপেক্ষা বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় সম্পর্ক ছিল অনেক বেশি গভীর।

চীনদেশের বৌদ্ধ ভিক্ষু হিউ এন-সাঙের বিবরণ থেকে সে-যুগের খোটান শহরের কথা জানতে পারা যায়। হিউ এন-সাঙ মধ্য-এশিয়ার পথে ভারতে প্রবেশ করেন। দেশে ফিরে যাবার সময় তিনি খোটান শহরটি পরিদর্শন করেন। ভারতের কুষাণ-রাজাদের আমলে চীনা-তুর্কীস্থানে খোটান রাজ্যটি স্থাপিত হয়। অল্পদিনের মধ্যে খোটান বৌদ্ধধর্ম এবং ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়। খোটানে বহু বৌদ্ধ মঠ ও স্তূপ নির্মিত হয়। তবে খোটানের স্থাপত্যে ভারতের শিল্পকলা ছাড়াও

গ্রীস, চীন ও পারস্যের শিল্পরীতির গভীর প্রভাব দেখা যায়। হিউ এন-সাঙ খোটানে ভারতের অধিবাসীদের বহু উপনিবেশ দেখতে পান। ভারতের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীও খোঠানে বাস করতেন। পরবর্তীকালে কোন প্রাকৃতিক কারণে খোটান শহরটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং মধ্য-এশিয়ার মরুভূমির বালুকারাশি তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে। ঐতিহাসিকরা খোটান অঞ্চল খুঁড়ে খুঁড়ে প্রাচীন খোটান শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। এই ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাচীন খোটানের শিল্প, ভাষা, ধর্ম ও স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

২য় পাঠ—তিব্বত ঃ

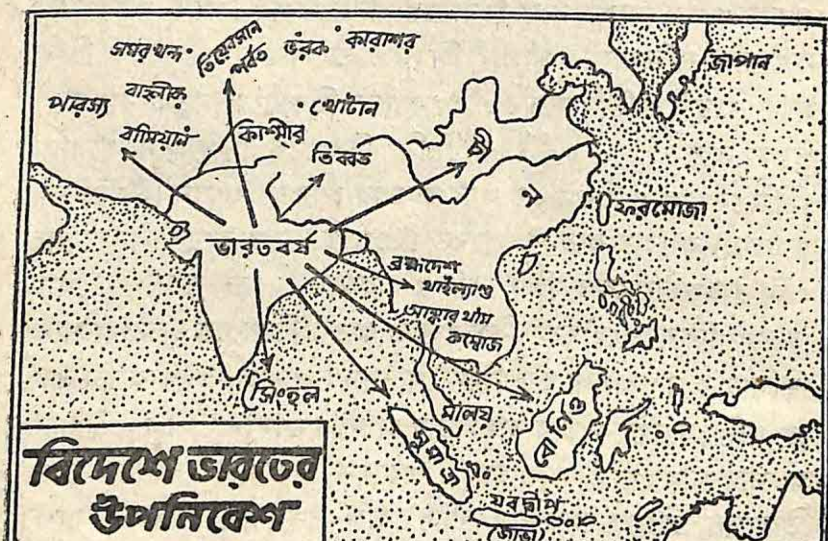
সপ্তম শতাব্দীতে তিববত একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়। ভারত ও চীন এই দু-দেশের সঙ্গে তিববতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিববতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা ছিলেন স্রং-শান-গাম-পো। তিনি লাসা শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে তিববতের নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তিববতের সিংহাসনে বসেন। তিনি নেপাল ও ত্রিহুত জয় করে রাজ্যের আয়তন বাড়ান। চীনদেশের রাজকন্যাকে বিয়ে করে তাঁর ক্ষমতা বিস্তারের ব্যবস্থা করেন। নেপালের এক রাজকুমারীকেও তিনি বিয়ে করেন। স্রং-শান-গাম-পোর চেষ্টায়ই তিববতে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। তিববতের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য তিনি খোটানের বর্ণমালা গ্রহণ করেন এবং বহু পণ্ডিত ব্যক্তিকে তাঁর রাজসভায় আমন্ত্রণ জানান। ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে স্রং-শান-গাম-পোর মৃত্যু হয়। একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিববতের রাজার আমন্ত্রণে মগধ থেকে বহু বৌদ্ধ তিববতে যান। এইসব সন্ন্যাসীর চেষ্টায় তিববতে বৌদ্ধধর্মের অনেক সংস্কারসাধন হয়।

অতীশ দীপঙ্কর—তিববতের রাজার আমন্ত্রণে যে-সব বাঙালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তিববতে যান, তাঁদের মধ্যে অতীশ দীপঙ্করই প্রধান। তিববতে এখনও তাঁর পূজা হয়। বাংলাদেশের বিক্রমপুরে গৌড়ের রাজবংশে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবার নাম কল্যাণশ্রী ও মায়ের নাম প্রভাবতী। ১৯ বছর বয়সে তিনি ওদন্ত-পুরী বিহারে আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে দীক্ষা নেন। তারপর সুবর্ণদ্বীপের প্রধান ধর্মাচার্য চন্দ্রকীর্তির কাছে তিনি বার বছর

বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দেশে ফিরে তিনি বিক্রমশীলা বিহারের প্রধান আচার্যের পদ লাভ করেন। তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তিব্বতে যান। তিব্বতের নানা জায়গায় তিনি ভ্রমণ করেন। এই সময় বৌদ্ধধর্মের সংস্কার এবং মহাযান ধর্ম প্রচার করাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। প্রায় তের বছর তিনি তিব্বতে বাস করেন এবং কমপক্ষে তু-শ বই লেখেন। ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

৩য় পাঠ—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সমুদ্রপথে ভারতের সম্পর্ক ঃ

ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের পূর্ব-উপকূলের রাজ্যগুলির সম্পর্ক গড়ে ওঠে।



বিদেশে ভারতের উপনিবেশ

ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা এবং সংস্কৃতিও এইসব অঞ্চলে ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে। ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মপ্রচার উপলক্ষে বহু ভারতীয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বসবাস করার জন্য স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তুলতে শুরু করে। পরবর্তী কালে কোন কোন অঞ্চলে স্থানীয় শাসকদের রাজনৈতিক তুর্বলতার সুযোগে ভারতের লোকেরা রাজ্য গড়ে তোলার সুযোগ পায়। মালয়, ক্যাম্বোডিয়া, আনাম, যবদ্বীপ বা যাভা, বালি ও বোর্নিও অঞ্চলে এইভাবেই ভারতবাসীরা

রাজ্যস্থাপন করার সুযোগ পায়। তবে এইসব রাজ্যের মধ্যে সুবর্ণ-দ্বীপ, চম্পা, কম্বোজ এবং সুবর্ণভূমি বা ব্রহ্মদেশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রথম দিকে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু-সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। এইসব অঞ্চলের অধিবাসীরাও হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতাকে অতি সহজেই গ্রহণ করে। হিন্দুধর্মের শৈব মতবাদ সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরে বৌদ্ধধর্মও এইসব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দুধর্মের মতো বৌদ্ধধর্মও স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে সমানভাবেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

সুবর্ণভূমি বা ব্রহ্মদেশ—ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের তেলুগু-ভাষা-ভাষী লোকেরাই প্রথম ব্রহ্মদেশে উপনিবেশ গড়ে তোলে। বৌদ্ধধর্মের হীনযান-মতে বিশ্বাসী এইসব ভারতীয়রা মনস্ নামে পরিচিত ছিল। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি-বিশ্বাসী পিয়ুস মনস্‌দের উপনিবেশের উত্তর দিকে প্রোম অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে একটি হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। রাজ্যটির নাম ছিল শ্রীক্ষেত্র। ক্রমে ক্রমে শ্রীক্ষেত্র-রাজ্য ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ব্রহ্মদেশের এক বিরাট অংশের উপর নিজেদের অধিকার স্থাপন করে। কিন্তু বিদেশী শত্রুর আক্রমণে নবম শতাব্দীতে শ্রীক্ষেত্ররাজ্য সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।

শ্রীক্ষেত্র-রাজ্যের পতনের পর উত্তরদিক থেকে ম্রাম্মা নামে পরিচিত দ্রাবিড় জাতির লোকেরা ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করে। অল্পদিনের মধ্যেই তারা হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে। ব্রহ্মদেশ জয় করে দ্রাবিড় জাতি একটি নূতন রাজ্য গঠন করে। অরিমর্দনপুর ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। ম্রাম্মাদের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা ছিলেন অনিরুদ্ধ। ১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে বসেন। ধর্মদর্শী নামে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে তিনি হীনযান-মতে দীক্ষা নেন। সামরিক শক্তির সাহায্যে তিনি সম্পূর্ণ ব্রহ্মদেশের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। তাঁর রাজত্বকালে ব্রহ্মদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম বিকাশ ঘটে। ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান।

রাজা অনিরুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ত্রিভুবনাদিত্য ধর্মরাজ সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকালে ভারত থেকে অনেক বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ব্রহ্মদেশে যান এবং সেখানে স্থায়িভাবে বসবাস

করতে থাকেন। ত্রিভুবনাদিত্য ধর্মরাজের আমলেই ব্রহ্মদেশের স্থাপত্যের সবচেয়ে সুন্দর নিদর্শন আনন্দমন্দিরটি তৈরি হয়।

ত্রিভুবনাদিত্য ধর্মরাজের মৃত্যুর পর ব্রহ্মদেশের হিন্দুরাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বংশের শেষ রাজা নরসিংহ-পতির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুরাজবংশের পতন হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—অর্থাৎ মালয় উপদ্বীপ, কম্বোজ, আনাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, বোর্নিও প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতের অনেক উপনিবেশ গড়ে ওঠে। এইসব অঞ্চলে স্থাপিত ভারতের উপনিবেশগুলো ধীরে ধীরে কয়েকটি বিশাল রাজ্যে পরিণত হয়। এদের মধ্যে কোন কোন রাজ্য প্রায় দেড় হাজার বছর পর্যন্ত নিজেদের অধিকার বজায় রাখে।

ইন্দোচীনের (বর্তমান ভিয়েতনাম) আনাম-নামে একটি প্রদেশে তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে একটি হিন্দুরাজ্য গড়ে ওঠে। চম্পা ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। পরে সমগ্র রাজ্যটির নাম হয় চম্পা রাজ্য। শ্রীমান ছিলেন চম্পার প্রথম হিন্দুরাজা। চম্পা রাজ্যের অন্যান্য রাজাদের মধ্যে জয়পরমেশ্বর বর্মণ, হরিবর্মণ, জয়ইন্দ্রবর্মণ, জয়সিংহবর্মণের নাম স্মরণীয়।

বর্তমান কম্বোডিয়া, কোচিন-চীন, শ্যাম এবং ব্রহ্মদেশের কিছু অংশ নিয়ে কম্বোজ রাজ্য গঠিত হয়। কম্বোজের রাজাদের মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় ও সপ্তম জয়বর্মণ ও দ্বিতীয় সূর্যবর্মণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। নয়-শ বছর পরে কম্বোজ রাজ্যের পতন হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলির মধ্যে চম্পা ও কম্বোজে ভারতের ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই রাজ্য দুটিতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা ছিল। চীনদেশের একজন ঐতিহাসিকের লেখা থেকে জানা যায় যে বহু ভারতীয় ব্রাহ্মণ এখানে বাস করতেন এবং শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনায় দিবারাত্র কাটাতেন। তাঁদের চেষ্টায় এই অঞ্চলে সংস্কৃত লিপিও প্রচলিত হয়। চম্পা ও কম্বোজের হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ভারতীয় ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয় দেয়।

যশোধরপুর—কম্বোজরাজ দ্বিতীয় জয়বর্মণ ৮০২ থেকে ৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কম্বোজের অঙ্কোর অঞ্চলে তিনি তাঁর রাজ্যের

নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। এই নূতন রাজধানীর নাম যশোধরপুর অথবা অঙ্কোরথোম। অল্পদিনের মধ্যেই যশোধরপুর হিন্দু-সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। সুন্দর সুন্দর বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির যশোধরপুরের বিভিন্ন স্থানে তৈরি হয়েছিল। এইসব মন্দির ছিল শাস্ত্র আলোচনার প্রধান কেন্দ্র।

অঙ্কোরভাট—কম্বোজের অঙ্কোরভাট মন্দিরটি প্রধানত বিষ্ণুর উপাসনার জন্য স্থাপিত হয়েছিল। তবে শিব, অর্জুন, যম এবং অন্যান্য বহু মূর্তিও এই মন্দিরের গায়ে আঁকা আছে, অঙ্কোরভাটের মন্দিরটি পৃথিবীর মধ্যে আকারে বৃহত্তম এবং সৌন্দর্যে অনুপম। এই মন্দিরের পরিকল্পনা, আয়তন ও শিল্পকর্ম বিস্ময়ের বস্তু।

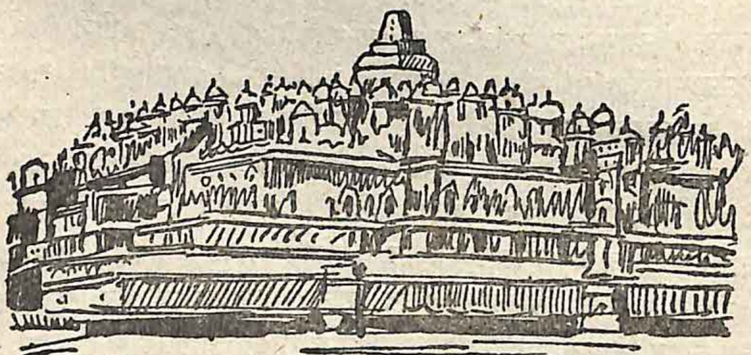
অঙ্কোরথোম—যশোধরপুর বা অঙ্কোরথোম ছিল কম্বোজরাজ্যের রাজধানী। অঙ্কোরথোমের ধ্বংসাবশেষ থেকে বোঝা যায় যে এই শহর তৈরির পিছনে চমৎকার একটি পরিকল্পনা ছিল। বর্গাকৃতি এই শহরটির চারদিকে তিন-শ ত্রিশ ফুট চওড়া পরিখা খুঁড়ে এবং পাথরের প্রাচীর দিয়ে শহরটিকে নিরাপদ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শহরের কোন কোন রাজপথ এক-শ ফুট পর্যন্ত চওড়া ছিল। বড় শহরের বিভিন্ন অংশে বড় বড় অনেক দীঘি কাটা হয়েছিল। শহরে প্রবেশ করার জন্য পাঁচটি প্রবেশ-পথ ছিল। এইসব পথে সবসময় পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কম্বোজের স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অঙ্কোরথোমের রেয়ন মন্দির। শহরের কেন্দ্রে পিরামিড আকারে তৈরি এই শিবের মন্দিরে চল্লিশটি গম্বুজ আছে। গম্বুজের চূড়াগুলি ধ্যানমগ্ন শিবের আকারে তৈরি। অঙ্কোরথোমের স্থাপত্যে পল্লবযুগের শিল্পের গভীর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

৪র্থ পাঠ—মালয় ও যবদ্বীপ ঃ

মালয় ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, বোর্নিও প্রভৃতি স্থান নিয়ে শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের নৌবাহিনী ছিল খুব শক্তিশালী। এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য খুব সমৃদ্ধ ছিল। আরব বণিকদের সঙ্গে শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আরব বণিকদের মতে এই রাজ্যের দৈনিক আয় দু-শ মণ সুবর্ণ।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শ্রীবিজয় নামে এক ব্যক্তি যবদ্বীপে একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর নাম অনুসারে এই রাজ্যের নাম হয় শ্রীবিজয় রাজ্য। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল তিক্তবিল্ব-নগর। অল্পদিনের মধ্যেই এই রাজ্য যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং মালয়ের উপর অধিকার স্থাপন করে। পরে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে শ্রীবিজয়-রাজবংশ যবদ্বীপ ত্যাগ করে বলিদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়। সেখানেও তারা একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করে। শৈলেন্দ্র-বংশের রাজারা ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ। ধর্মের ব্যাপারে তাঁরা ভারতবর্ষ ও চীনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। বাঙ্গালী বৌদ্ধ ভিক্ষু কুমারঘোষ ছিলেন তাঁদের ধর্মগুরু। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র রাজবংশের পতন হয়।

বরবুদর—শৈলেন্দ্র-বংশের রাজারা শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বরবুদরের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দিরটি তাঁদের আমলে তৈরি হয়। এই মন্দিরটির মোট আয়তন চার-শ বর্গ ফুট। এই মন্দিরের গায়ে অসংখ্য



বরবুদর

বুদ্ধমূর্তি আঁকা আছে। বরবুদর ভারতীয় ও যবদ্বীপের ভাস্কর্যরীতির সংমিশ্রণের এক সুন্দর নিদর্শন। শৈলেন্দ্র রাজাদের আমলেই যবদ্বীপের তারামন্দিরটি নির্মিত হয়।

● মনে রাখবে

১. কুষাণ-সম্রাট কণিষ্কের সময়ে কুষাণ-সাম্রাজ্য মধ্য-এশিয়ার খোটান ও খোরাসান থেকে পূর্বে বিহার ও দক্ষিণে উজ্জয়িনী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কণিষ্ক

নিজে মহাযান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর চেষ্টায় এই ধর্মমত মধ্য-এশিয়ায় প্রচারিত হয়।

২. মধ্য-এশিয়া থেকে বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে প্রবেশ করে। এই প্রচারে প্রধান ভূমিকা নেন মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কাশ্যপ মাতঙ্গ। এর পর ভারত থেকেও বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী চীনে যান। চীনদেশ থেকেও শিক্ষার্থীরা আসতেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

৩. শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই নয়, বাণিজ্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষের সঙ্গে এসব দেশের সংযোগ গড়ে ওঠে। চীনা-তুর্কীস্তানের খোটান রাজ্যটি তো বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি বিরাট কেন্দ্র হয়ে ওঠে। খোটান শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে যে-সব নির্দশন পাওয়া যায়, হিউ এন-সাঙের বর্ণনার সঙ্গে তার মিল দেখা যায়।

৪. তিব্বতের সঙ্গে মধ্যযুগে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে বাঙালী বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী অতীশ দীপঙ্কর ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে যান এবং সেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ভূমিকা নেন। এ ছাড়া, মগধ থেকেও বিভিন্ন সময়ে বহু বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী তিব্বতে যান।

৫. মধ্যযুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সমুদ্রপথে ভারতের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সম্পর্কের সূচনা ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে, তারপর ধীরে ধীরে ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিও এসব অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। এসব দেশের মধ্যে প্রধান হল সুবর্ণভূমি বা ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, কম্বোজ, আনাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ও বোর্নিও।

৬. ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে এমন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ: অঙ্কোরভাটের বিষ্ণুমন্দির, অঙ্কোরথোমের বেয়ন-মন্দির, বরবুদরের বৌদ্ধ মন্দির।

অনুশীলনী

১। মধ্য-এশিয়া ও চীনের সঙ্গে কিভাবে ভারতের সম্পর্ক গড়ে ওঠে? এই সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলাফল আলোচনা কর।

২। তিব্বতের সঙ্গে কিভাবে ভারতের সম্পর্ক গড়ে ওঠে? তিব্বতে কিভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়?

৩। সুবর্ণভূমি কোথায়? কিভাবে সুবর্ণভূমিতে ভারতের প্রভাব বিস্তার লাভ করে?

৪। মালয়, কম্বোজ প্রভৃতি স্থানে কিভাবে ভারতীয় রাজ্য গড়ে ওঠে?

৫। শৈলেন্দ্র রাজবংশের ইতিহাস আলোচনা কর।

৬। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

(ক) যশোধরপুর, (খ) অঙ্কোরভাট ; (গ) অঙ্কোরথোম ; (ঘ) বরবুদর ; (চ) চম্পা ; (ছ) শ্রীক্ষেত্র রাজ্য ; (জ) অরিমর্দনপুর ; (ঝ) অতীশ দীপঙ্কর ; (ঙ) কুমারজীব।

৭। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) কোন্ পথে চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক গড়ে ওঠে ? কাশ্যপ মাতঙ্গ কে ছিলেন ? (গ) স্রং-শান-গাম-পো কে ছিলেন ? (ঘ) লাসা শহর কে প্রতিষ্ঠা করেন ? (চ) জয়বর্মণ কোথাকার রাজা ছিলেন ? (চ) অঙ্কোরথোমের স্থাপত্যে কোন্ যুগের প্রভাব দেখা যায় ? (ছ) শ্রীবিজয় রাজ্যের রাজধানীর নাম কি ? (জ) কুমারজীব কোন্দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন ?

৮। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) তিব্বতের সবচাইতে শক্তিশালী রাজা ছিলেন—। (খ) অতীশ দীপঙ্করের পিতার নাম—মাতার নাম—। (গ) কম্বোজরাজ দ্বিতীয় জয়বর্মণ—খ্রীষ্টাব্দ থেকে—খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। (ঘ) অল্পদিনের মধ্যেই যশোধরপুর—সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

দিল্লীর সুলতান

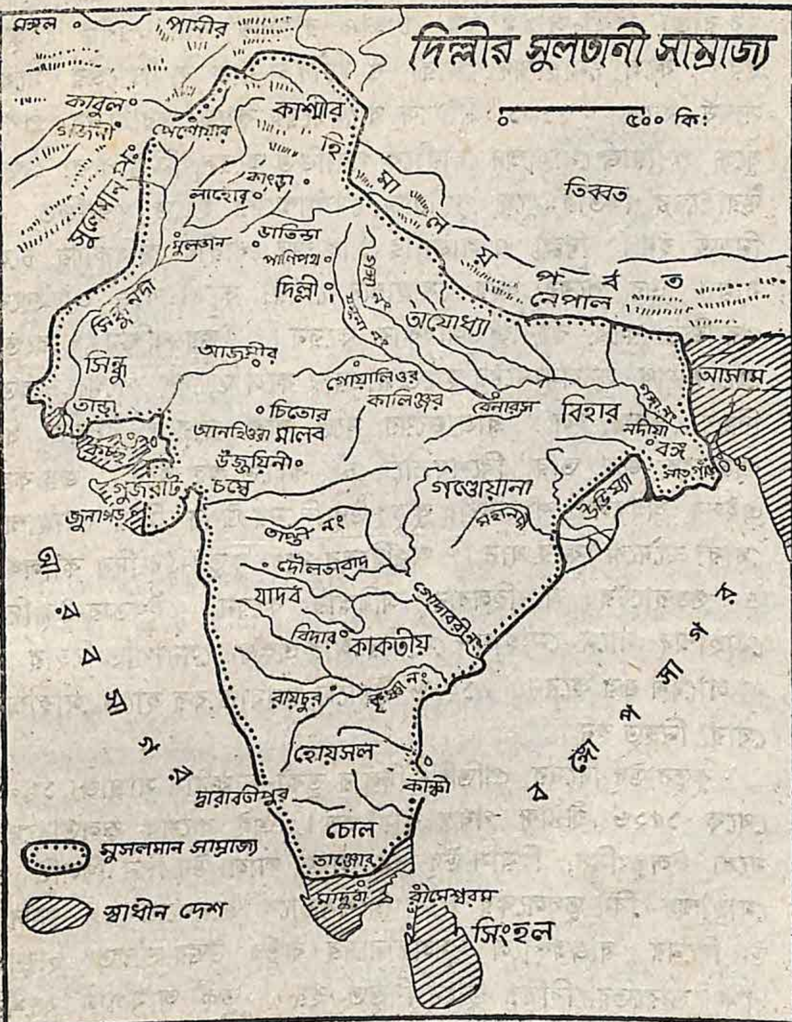
ত্রয়োদশ অধ্যায়

(১২০৬-১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ)

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সিন্ধুদেশ ও পাঞ্জাবের কোন কোন স্থানে আরবের মুসলমানদের অধিকার স্থাপিত হয়। তবে ভারতের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে মুসলমানদের উপস্থিতির কোন গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু আফগানিস্তানে মুসলমানদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়ায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে ভারতের উপর মুসলমানদের আক্রমণের আশঙ্কা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। গজনীর মুসলমান শাসকেরা নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সতের বার ভারত আক্রমণ করেন। তবে ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করার কোন ইচ্ছাই

তাঁর ছিল না। হিন্দুদের মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করা এবং ধনরত্ন লুট করাই ছিল মামুদের অভিযানের প্রধান লক্ষ্য।

১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর গজনী রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। গজনীর দুর্বলতার সুযোগে পার্শ্ববর্তী ঘুর রাজ্য গজনী



অধিকার করে। ঘুর রাজ্যের শাসনকর্তা গিয়াস-উদ্-দিন ঘোরীর ভ্রাতা মোহাম্মদ ঘোরী সুলতান মামুদের মতো কয়েকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তবে হিন্দু মন্দির লুট করেই মোহাম্মদ

ঘোরী সন্তুষ্ট থাকেননি। ভারতে মুসলমান অধিকার স্থাপন করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মোহাম্মদ ঘোরী ভারতে প্রবেশ করে মুলতান, উচ্, পেশোয়ার ও লাহোর জয় করেন। লাহোর জয়ের ফলে ঘুর-রাজ্য দিল্লী-আজমীরের চৌহান রাজ্যের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ফলে মোহাম্মদ ঘোরী ও চৌহান-রাজ পৃথ্বীরাজের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বরের কাছে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ মোহাম্মদ ঘোরীকে পরাজিত করেন, কিন্তু পরের বছর তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ মোহাম্মদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। দিল্লী ও আজমীর মোহাম্মদ ঘোরীর অধিকারে চলে যায়। এর পরের বছর মোহাম্মদ ঘোরী কনৌজরাজ জয়চন্দ্রকে পরাজিত করে কনৌজ অধিকার করেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রবেশ-পথ মুসলমানদের হাতে যাওয়ার ফলে তাদের পক্ষে ভারত-বিজয় সহজ হল। রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য তারা বিশেষভাবে চেষ্টা করতে শুরু করে। জয়-করা এইসব অঞ্চলের শাসনভার কুতুব-উদ্-দিনের উপর দিয়ে মোহাম্মদ ঘোরী স্বদেশে ফিরে যান। অল্পদিনের মধ্যে কুতুব-উদ্-দিন কালিঞ্জর ও গুজরাটের আনহিলবারা অধিকার করেন। ইখতার-উদ্-দিন মোহাম্মদ নামে মোহাম্মদ ঘোরীর আর-একজন সেনাপতি বিহার ও বাংলাদেশ জয় করেন। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তঘাতকের হাতে মোহাম্মদ ঘোরী নিহত হন।

কুতুব-উদ্-দিনের প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর তুর্কী-আফগান সাম্রাজ্য ১২০৬ থেকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই বংশের সুলতানদের মধ্যে ইলতুৎমিস, গিয়াস-উদ্-দিন বলবন, আলা-উদ্-দিন খিলজি ও মোহাম্মদ বিন-তুঘলকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলা-উদ্-দিনের রাজত্বকালে মুসলমানদের কর্তৃত্ব উত্তর-ভারত ছাড়াও দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হয়। তুর্কী-আফগান বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত করে মোগল-বংশের বাবর ভারতের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। পানিপথের যুদ্ধের পরই ভারতে তুর্কী-আফগান যুগের অবসান ঘটে।

২য় পাঠ—তুর্কী-আফগান যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ঃ

তুর্কী-আফগান যুগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে মুসলমান-দের কর্তৃত্ব স্থাপনের ফলে ভারতের রাজনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। ভারতের কোটি কোটি হিন্দু অধিবাসী বিদেশী ও অন্য ধর্মাবম্বলীরা মুসলমানদের অধীন হয়ে পড়ে। ভারতের বিভিন্ন



মোহাম্মদ বিন-তুঘলক



আলা-উদ্-দিন খিলজি

জায়গায় কয়েকটি ছোট ছোট হিন্দু রাজ্য কোনমতে নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারলেও অল্পদিনের মধ্যেই তারা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তুর্কী-আফগান যুগের প্রথমদিকে মুসলমানদের সংখ্যা খুব কম ছিল বলে সুলতানদের দরবারে নিয়মিত কর দিয়ে কোন কোন হিন্দু রাজা তাঁদের নামমাত্র স্বাধীনতা বজায় রাখে। কিন্তু পরে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইসব হিন্দু-রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। হিন্দুদের রাজত্বের অবসানের পর বহু হিন্দু সৈন্য মুসলমান শাসকের সেনাবিভাগে যোগ দেয়।

তুর্কী-আফগান শাসকেরা এক নূতন রাজনৈতিক আদেশও ভারতে স্থাপন করে। সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল তুর্কী-আফগান বংশের সুলতানেরা শাসক হিসেবে ছিলেন স্বৈরাচারী ও সর্বশক্তিমান। একমাত্র ধর্মীয় বিধি-বিধানই তাঁদের ক্ষমতা সামান্য পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। সুলতানদের অধীন বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তারাও তাঁদের মতোই ক্ষমতা ভোগ করতেন।

শাসনতন্ত্র শক্তিশালী ও স্থায়ী করে তোলার জন্য মুসলমান শাসকেরা প্রাচীন ভারতের শাসননীতির অনেক পরিবর্তন করেন।

ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে হিন্দুদের সমাজজীবনে অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। মুসলমানদের পূর্বে গ্রীক, শক, হূণ, প্রভৃতি বৈদেশিক জাতি ভারতে প্রবেশ করেছিল। তবে তারা অল্পদিনের মধ্যেই ভারতীয় ভাষা, ধর্ম ও সামাজিক রীতি-নীতি গ্রহণ করে হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিলে-মিশে যায়। কিন্তু মুসলমানরা তাদের নিজস্ব একটি বিশিষ্ট ধর্ম ও সভ্যতা নিয়ে ভারতে আসে। সেজন্য অন্যদের মতো তাদের পক্ষে ভারতীয় সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও ধর্ম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে হিন্দুসমাজের জাতিভেদপ্রথা, উচ্চ রাজপদ লাভের আকাঙ্ক্ষা, জিজিয়া ও তীর্থকরের হাত থেকে রেহাই পাওয়া প্রভৃতি কারণে বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। ইসলাম ধর্মের গ্রাস থেকে ভারতীয় সমাজকে রক্ষা করার জন্য হিন্দুধর্মের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ব্যবস্থাদি আরও কঠোর করে তোলা হয়।

ভারতে মুসলমান অধিকার স্থাপনের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনেও অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। তুর্কী-আফগান যুগে হিন্দু সামন্তদের পরিবর্তে মুসলমান সামন্তদের উদ্ভব হয়। তখন থেকেই ভূমি-রাজস্ব বিভাগেও অনেক পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে। হিন্দু-রাজাদের পতনের ফলে ও সামরিক বিভাগে যোগ দেওয়ার সুযোগ কমে যাওয়ায় বহু হিন্দু সৈন্য জীবিকা-অর্জনের জন্য চাষবাসের কাজ নিতে বাধ্য হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের কর্তৃত্ব বেড়ে যায়। তুর্কী-আফগান যুগে মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য বাড়লেও সমুদ্র-পথের বাণিজ্য ক্রমেই কমে যেতে থাকে। জিজিয়া, তীর্থকর প্রভৃতি করের জন্য হিন্দুদের আর্থিক দুর্দশায় পড়তে হয়। তুর্কী-আফগান যুগে শাসকদের আয় প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেলেও সাধারণ প্রজাদের অর্থনৈতিক অবস্থা যথেষ্ট খারাপ হয়ে যায়।

হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের উপর পারস্পরিক প্রভাব—হিন্দু ও মুসলমান —এই দুটি ধর্মের বিধি-বিধান এবং সমাজের রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারের মধ্যে অনেক পার্থক্য। কিন্তু দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস

করার ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পার্থক্য ক্রমেই দূর হতে থাকে। একের অন্যকে জানার আগ্রহ পরস্পরকে প্রভাবিত করে। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কও ঘটতে থাকে। ফলে হিন্দুসমাজের বহু আচার-ব্যবহার মুসলমান সমাজে প্রবেশ করে। হিন্দুরাও আরবী-ফার্সী ভাষা শিখে সুলতানদের অধীনে চাকরি নিতে থাকে। এভাবে মুসলমান সমাজের আচার-আচরণ পোশাক-পরিচ্ছদ হিন্দুসমাজে প্রবেশ করে। এইরূপে নানাভাবে ধীরে ধীরে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ পরস্পরের কাছাকাছি আসতে থাকে।

শিল্প ও সাহিত্য—আফগান সুলতানদের আমলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এক নূতন সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সে-যুগের সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে তার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু-মন্দিরে মুসলমান শিল্প-রীতির ও মুসলমানদের মসজিদে হিন্দু-শিল্পকলার প্রভাব অনেক জায়গাতেই লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই প্রভাব আরও গভীর। সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্য খুব উন্নত হয়। সুলতানদের উৎসাহে মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করা হয়। বাংলাদেশের সুলতান হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে দিয়ে মহাভারত অনুবাদ করান। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁ কবি শ্রীকর নন্দীকে মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব অনুবাদ করতে উৎসাহ দেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণও এই যুগের রচনা বলে অনেকে মনে করেন। বঙ্গদেশের সুলতান বারবাক শাহের আমলে মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদ করেন।

ভক্তিবাদ—দিল্লীর সুলতানী আমলে ইসলামের ধর্মের প্রভাব থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার অতি-উৎসাহে হিন্দুসমাজে নানা রকমের গোঁড়ামি দেখা দেয়। ইসলাম ধর্মের তরফ থেকে হিন্দুধর্মের উপর যতই আক্রমণ আসতে শুরু করল, ততই হিন্দুসমাজে জাতিভেদের কঠোরতা বাড়তে লাগল। একদিকে সমাজে উচ্চবর্ণের লোকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে যায়, অন্যদিকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা অত্যাচারিত হতে থাকে। এই অবস্থায় ধর্ম ও সমাজের সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তি ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে এগিয়ে আসেন।

তাঁরা ভক্তিবাদ নামে এক উদার ধর্মনীতি প্রচার করতে শুরু করেন। তাঁদের মতে ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়। ভগবানের কাছে উঁচু বা নীচু বলে কেউ নেই, সব মানুষই সমান।

শ্রীচৈতন্যদেব—১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব বাংলাদেশের নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যের আগেকার নাম ছিল বিশ্বম্ভর। আদর করে তাঁকে গৌরাঙ্গ, নিমাই প্রভৃতি নামেও ডাকা হত। তাঁর বাবার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মায়ের নাম শচীদেবী। তরুণ বয়সেই পণ্ডিত হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং টোল খুলে তিনি অধ্যাপনা করতে থাকেন।



শ্রীচৈতন্য

চব্বিশ বছর বয়সে নিমাই সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বরীপুরী নামে এক সন্ন্যাসীর শিষ্য হন। তারপরে কয়েক বছর ধরে তিনি প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ান এবং তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। তখনকার ভারতবর্ষের বহু পণ্ডিত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিছুকাল তিনি বৃন্দাবনে বাস করেন। তাঁর চেষ্টাতেই বৃন্দাবন বৈষ্ণবদের মহাতীর্থে পরিণত হয়। তাঁর ধর্মমত দক্ষিণ-ভারতেও ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পুরীতে বাস করার শেষ বার বছর শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাতেই সমস্ত দিন কাটাতেন। মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুরীতে দেহত্যাগ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেব মনে করতেন ঈশ্বরের প্রতি শুদ্ধপ্রেম ও ভক্তিই

মুক্তির একমাত্র উপায়। তাঁর মতে, ছোট-বড় সকলেরই ভগবানকে পূজা করার অধিকার আছে। তাঁর কাছে সব মানুষই সমান। তিনি জাতিভেদ মানতেন না। হরিদাস নামে এক মুসলমান তাঁর শিষ্য ছিলেন। পূর্ব-ভারতের সমাজজীবনে চৈতন্যদেবের নূতন ধর্ম গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর জীবনী ও বাণী নিয়ে বাংলায় এক মধুর বৈষ্ণব সাহিত্য গড়ে ওঠে।

নানক—মধ্যযুগের ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে নানক একটি চিরস্মরণীয় নাম। লাহোরের কাছে তালবন্দী গ্রামে ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নানকের জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকেই ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। পরে তিনি নিজেই একটি ধর্মমত প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম শিখধর্ম। তাঁর মতে, মানুষে মানুষে যেমন কোন পার্থক্য নেই, তেমনই বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেও কোন ভেদ নেই। বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের চেষ্টাকে তিনি তাঁর জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। মূর্তিপূজাকে তিনি অর্থহীন বলে মনে করতেন। আন্তরিক-ভাবে ভগবানের উপাসনা করা এবং চিত্তকে শুদ্ধ রাখা—এই ছিল তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূলকথা। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের যুক্তিহীন কুসংস্কার এবং প্রয়োজনহীন অনুষ্ঠান নানক সমর্থন করতেন না। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে তিনি তাঁর এই ধর্মমত প্রচার করেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নানক দেহত্যাগ করেন। নানকের উপদেশবাণী 'গ্রন্থসাহেব' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।


নানক

কবীর—বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম প্রচারক রামানন্দের প্রধান শিষ্য ছিলেন কবীর। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুকাল ঠিকভাবে জানা যায় না। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই কবীর বারাণসীতে কাটান। ছেলেবেলায় তিনি লেখাপড়ার বিশেষ কোন সুযোগ পাননি। তাঁতীর ঘরের ছেলে—সেই কাজই তাঁকে করতে হত। কিন্তু সংসারের চেয়ে ধর্মের দিকেই তাঁর বেশি ঝোঁক ছিল। হিন্দুদের ভক্তিবাদ ও মুসলমানদের সুফী

মতবাদ তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পরবর্তী জীবনে তিনি রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং হিন্দি ভাষায় তাঁর ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি বা মুসলমান ধর্মের সংকীর্ণতাকে তিনি পছন্দ করতেন না। গুরু রামানন্দের মতো তিনিও জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকেই সমান চোখে দেখতেন। রাম ও আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়—এই ছিল তাঁর মূল বাণী। কবীর তাঁর ধর্মমত প্রচারের জন্য কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। ছোট ছোট নীতিমূলক অনুপম কবিতার সাহায্যে তিনি তাঁর ধর্মমত ব্যাখ্যা করতেন। এইসব কবিতা দোঁহা নামে পরিচিত। দোঁহাগুলিতে উচ্চভাবের দর্শন-তত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই কবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। কবীরের শিষ্যরা কবীর-পন্থী নামে পরিচিত।



কবীর

৩য় পাঠ—ইলিয়াসশাহী ও হুসেনশাহী যুগে বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন:

১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইলিয়াস-শাহী ও হুসেন-শাহী বংশের সুলতানেরা বঙ্গদেশ শাসন করেন। এঁদের মধ্যে ইলিয়াস শাহ, সিকন্দর শাহ, হুসেন শাহ ও নুসরৎ শাহের নাম বিশেষভাবে উলেখযোগ্য। তাঁদের সুশাসনে বঙ্গদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়, আর বঙ্গদেশে আবার শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যায়। চাষবাসের যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং দেশের সমৃদ্ধি আবার ফিরে আসে।

এই সময় বাংলাদেশের সমাজজীবনেও অনেক পরিবর্তন দেখা

দেয়। হিন্দু ও মুসলমান দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস করার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক দেখা যায়। ভক্তিবাদ ও সুফী মতবাদের প্রভাবে হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মজীবনে যে পরিবর্তন এসেছিল, বাংলাদেশের সমাজজীবনেও তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ইলিয়াস-শাহী ও হুসেন-শাহী বংশের সুলতানদের শিল্পের প্রতি খুব অনুরাগ ছিল। এই সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক মন্দির, মসজিদ ও হাসপাতাল তৈরি করা হয়। গৌড়ের দাখিল দরওয়াজা, ছোট সোনা মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ, ফিরোজ মিনার, বারদুয়ারী এবং আদিনার মসজিদ এই যুগের স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। হুসেন শাহের আমলে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং বৈষ্ণবধর্ম প্রচার। হুসেন শাহের আমলে সাহিত্যও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। রূপ গোস্বামী বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নামে দু-খানা গ্রন্থ রচনা করেন। মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, যশোরাজ খান প্রভৃতি সে-যুগের সাহিত্য-রচয়িতাদের অন্যতম।

মনে রাখবে

১. খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকেই আরবদেশের মুসলমানেরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোন কোন অঞ্চল আক্রমণ করতে শুরু করে। কিন্তু তখনও স্থায়ী অধিকারের কথা তারা ভাবেনি। গজনীর সুলতান মামুদ দশম শতাব্দীর শেষ দিকে ভারত আক্রমণ করেন। হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করা এবং ধনরত্ন লুণ্ঠন করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এরপর মোহাম্মদ ঘোরী ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং স্থায়ী মুসলমান অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবেশ করেন। বুদ্ধি-বলে ও রণকৌশলে তিনি আফগানিস্তান থেকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

২. ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন কুতুব-উদ্-দিন এবং দিল্লীর তুর্কী-আফগান সাম্রাজ্য ১২০৬ থেকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইলতুৎমিস, গিয়াস-উদ্-দিন বলবন, আলা-উদ্-দিন খিলজি ও মোহাম্মদ-বিন-তুঘলক।

৩. তুর্কী-আফগান যুগে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বেড়ে যায়, হিন্দুরা শক্তিহীন হয়ে পড়ে। হিন্দুসমাজের জাতিভেদপ্রথা, উচ্চরাজপদের লোভ, জিজিয়া ও তীর্থকরের হাত থেকে রেহাই পাওয়া প্রভৃতি কারণে অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ইসলাম ধর্মের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা

করতে গিয়ে হিন্দুসমাজ সংস্কার আঁকড়ে থাকতে চেষ্টা করে, হিন্দুধর্মের বিধি-নিষেধের কঠোরতা বেড়ে যায়। এই আমলে সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে।

৪. পাশাপাশি থাকতে থাকতে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম—একে অপরকে কম-বেশি প্রভাবিত করে। সে-যুগের সাহিত্য-শিল্পেও এর প্রভাব দেখা যায়। মুসলমান শাসনকর্তাদের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু লেখকেরা অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, ভাগবত ও মহাভারতাদি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

৫. ভক্তিবাদের অভ্যুত্থান ঘটে এসময়ে। জাতি-ধর্মের ভেদ অস্বীকার করে এই উদার ধর্মমতের প্রচার করেন—বঙ্গদেশের শ্রীচৈতন্যদেব, পাঞ্জাবের নানক, উত্তর-ভারতের কবীর প্রমুখেরা।

৬. বঙ্গদেশে ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহের আমল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ দূর হয়ে যায়। দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, এবং অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় নূতন চেতনা লক্ষ্য করা যায়।

অনুশীলনী

১। মুসলমান শক্তির দ্বারা দিল্লী-জয়ের কাহিনীটি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। মোহাম্মদ ঘোরী সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

৩। তুর্কী-আফগান যুগে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল?

৪। তুর্কী-আফগান যুগে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম একে অপরের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে?

৫। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী সংক্ষেপে লেখ।

৬। গুরু নানকের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৭। কবীরের জীবনী সংক্ষেপে লেখ।

৮। ইলিয়াস-শাহী ও হুসেন-শাহী যুগের বঙ্গদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন কিরূপ ছিল?

৯। সংক্ষেপে উত্তর দাও:

(ক) সুলতান মামুদ কি উদ্দেশ্যে ভারত আক্রমণ করেন?

(খ) মোহাম্মদ ঘোরী কোথাকার লোক ছিলেন? তাঁর ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য কি ছিল?

(গ) কুতুব-উদ্-দিন প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের নাম কি? এই সাম্রাজ্যের কয়েকজন সম্রাটের নাম লেখ।

(ঘ) তুর্কী-আফগান যুগের সাহিত্য সম্পর্কে যা জান লেখ।
(ঙ) ভক্তিবাদ সম্পর্কে কি জান?

১০। এক কথায় উত্তর দাও:
(ক) কোন্ যুদ্ধে মোহাম্মদ ঘোরী পরাজিত হন? (খ) কোন্ যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হন? (গ) কোন্ মুসলমান সুলতান দিল্লীর সিংহাসনে প্রথম বসেন? (ঘ) কোন্ যুদ্ধের ফলে ভারতে তুর্কী-আফগান রাজত্বের অবসান ঘটে? (ঙ) কোন্ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কোন্ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কী-আফগান সুলতানরা দিল্লীর সিংহাসনে ছিলেন? (চ) কোন্ সুলতানের আমলে উত্তর-ভারত ছাড়া দক্ষিণ-ভারতেও মুসলমানদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়? (ছ) শ্রীচৈতন্যদেব কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

১১। সঠিক উত্তরের পাশে √-চিহ্ন দাও:
(ক) ১৪৮৬/১৪৮৫/১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন।
(খ) ১৪৬৯/১৪৭০/১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দে নানক জন্মগ্রহণ করেন?
(গ) ১৫২৫/১৫২৬/১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পানিপথের যুদ্ধ হয়।
(ঘ) কবীর/নানক/শ্রীচৈতন্যদেব/রামানন্দের শিষ্য ছিলেন।
(ঙ) ইব্রাহিম লোদী/সিকন্দর/বাহলুল লোদী ছিলেন শেষ তুর্কী-আফগান সুলতান।

১২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:—
(ক) পানিপথের প্রথম যুদ্ধের পরেই ভারতে—যুগের অবসান ঘটে। (খ) মাত্র ৪৮ বছর বয়সে—খ্রীষ্টাব্দে। শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে দেহত্যাগ করেন। (গ) মধ্যযুগের ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে—এক চিরস্মরণীয় নাম।

চতুর্দশ অধ্যায়

মধ্যযুগের অবসান (চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী)

কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন: ইয়োরোপের নবজাগরণের উপর তার প্রভাব:

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোমান সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদের নেতৃত্বে মুসলমানগণ কনস্ট্যান্টিনোপল আক্রমণ করে। পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের শেষ গ্রীক সম্রাট ষষ্ঠ কনস্ট্যাণ্টাইন মুসলমানদের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। তিনদিন ধরে বিজয়ী সৈন্যরা কনস্ট্যান্টিনোপলে

নির্বিচারে লুটপাট ও হত্যালীলা চালায়। বিখ্যাত সোফিয়া গির্জাকে তারা মসজিদে পরিণত করে। বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের পতনের ফলে সমগ্র ইয়োরোপে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কনস্ট্যান্টিনোপল পুনরুদ্ধারের জন্য আবার ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং ইয়োরোপ থেকে একদল সৈন্যও সেখানে পাঠাবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কনস্ট্যান্টিনোপলে সৈন্য পাঠানো সম্ভব হয়নি।

কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের ফলে শুধু পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের অবসান ঘটেনি—এই সময় থেকেই মধ্যযুগেরও অবসান ঘটে, আর আধুনিক যুগ এবং নবজাগরণের সূচনা হয়। তবে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের আগেই ইয়োরোপের জনসাধারণের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। তারা সব-কিছুকে যুক্তি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করে। মধ্যযুগের শেষ পর্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম-চিন্তা ও মতবাদের ক্ষেত্রে পেত্রার্ক, ইরাস-মাস প্রভৃতি পণ্ডিতরা এক বিরাট পরিবর্তন আনেন। এক নূতন যুগের সূচনা লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে জেনোয়া, ভেনিস, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি স্থানের শাসকদের আগ্রহে বহু নাবিক নূতন নূতন দেশের সন্ধানে অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেন। এই সময় থেকেই আটলান্টিক মহাসাগরের অনেক দ্বীপ এবং আফ্রিকার অনেক অঞ্চলের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে। এইসব নাবিকের দৃষ্টান্তই ম্যাগেলান, কলম্বাস, ভাস্কো-ডা-গামা, অ্যামেরিগো ভেসপুচি প্রভৃতি নাবিককে অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিতে আগ্রহী করে তোলে। তাঁদের চেষ্টার ফলে ইয়োরোপের জনসাধারণ চীন, জাপান, আফ্রিকা, আমেরিকা ও ভারতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে। আধুনিক যুগের আর-একটি বৈশিষ্ট্য জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি—মধ্যযুগেই এর সূচনা দেখা যায়। ফিলিপ-অগাস্টাসের রাজত্বকালে ফ্রান্স পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে একটি জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করার প্রথম সুযোগ পায়। পরে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এক-শ বছর ধরে যুদ্ধ করে ফ্রান্সের সম্রাট সমস্ত ফ্রান্সের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। বিজয়ী উইলিয়ম এবং দ্বিতীয় হেনরীর কার্যকলাপ ও শাসনসংস্কারের ফলে ইংলণ্ডে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। স্পেন ও পর্তুগালে এই যুগেই জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হয়। স্পেনের স্বৈরাচারী

শাসনের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে এই যুগেই নেদারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা স্বাধীনতা লাভ করে।

ধর্ম-নিরপেক্ষ গ্রীক-রোমান সাহিত্য, ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রসার, জাতীয় রাষ্ট্র গঠন প্রভৃতির ফলে ইয়োরোপের জনসাধারণের মনে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। মধ্যযুগের ধর্মীয় অনুশাসন, কুসংস্কার এবং বাধা-নিষেধের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই যুগেই স্বাধীনভাবে সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি সৃষ্টি করার দিকে প্রচণ্ড ঝোঁক দেখা দেয়। নূতন চিন্তাধারা ও চিরাচরিত চিন্তাধারার মধ্যে সংঘর্ষের সূচনা হয়। ইটালির ফ্লোরেন্স শহরে এই সংঘর্ষ ভয়ানক আকার ধারণ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আধুনিক চিন্তাধারারই জয় হয়। অন্যদিকে চার্চ ও খ্রীষ্টান ধর্মের সংস্কারের জন্যও একদল যাজক যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করেন।

মধ্যযুগের শেষ দিকে উদারপন্থী চিন্তাধারা সাধারণ মানুষের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই সময় ইংলণ্ডে মহামারীরূপে প্লেগ দেখা দেয় এবং বহু লোক মারা যায়। ফলে ইংলণ্ডে শ্রমিকের অভাব দেখা দেয়। জোর করে কম মজুরিতে কৃষক ও শ্রমিকদের কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য মালিকরা চেষ্টা করে। এজন্য কৃষক-শ্রমিকরা খুব অসন্তুষ্ট হয় এবং তীব্রভাবে এই নীতির প্রতিবাদ করতে থাকে। ওয়াট টাইলার নামে এক ব্যক্তি শ্রমিকদের এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। যদিও ওয়াট টাইলারকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তবু ইংরেজ শাসকেরা শ্রমিকদের দাবি সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করতে পারেনি। দুর্বল ও নির্যাতিত মানুষ আত্মবিশ্বাসে জেগে উঠেছিল এই কথা ভেবে—মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই।

সমস্ত ইউরোপ এইভাবে যখন একটা নূতন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল তখন হঠাৎ এল কনস্ট্যান্টিনোপল পতনের খবর। সঙ্গে সঙ্গে বহু গ্রীক পণ্ডিত প্রাণভয়ে কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে পালিয়ে এসে পশ্চিম-ইয়োরোপের বিভিন্ন শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইটালির শহরগুলো সাদরে তাঁদের অভ্যর্থনা জানায়। এইসব পণ্ডিতেরা সঙ্গে করে এনেছিলেন বহুসংখ্যক গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থ। ইয়োরোপের লোকেরা গভীর আগ্রহে এইসব গ্রন্থ পড়তে

শুরু করে এবং এ থেকে তারা একটা নূতন জগতের সন্ধান পায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং দর্শনের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় এক বিপুল আলোড়ন। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে দেখা দেয় বিরাট পরিবর্তন। মানুষ নিজেকে ও তার মনকে নূতন করে আবিষ্কার করার সুযোগ পায়। ইয়োরোপের চিন্তাজগতে এক নবজাগরণ আসে। ইটালি ও স্পেনে এই জাগরণের প্রথম সূচনা। এরপর নবজাগরণের নূতন চিন্তাস্রোত আল্পস পর্বত ছাড়িয়ে জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগের অবসান ঘটে।

মনে রাখবে

১. খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অটোমান সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদের আক্রমণের ফলে কনস্ট্যাণ্টিনোপলের পতন হয়। ইয়োরোপের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এটি।

২. মধ্যযুগের অবসানে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটল।

৩. অবশ্য পাশ্চাত্যে এর আগেই নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। অজানাকে জানবার আগ্রহ, বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা ও আবিষ্কার, সাহিত্যে মানবতাবাদের জয়, জ্ঞানের পরিধি বিস্তার, নূতন নূতন ভৌগোলিক আবিষ্কার—মানুষের চিন্তারাজ্যে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। মধ্যযুগের অবসানে এই নবজাগরণের চিন্তাধারা আরও এগিয়ে যায়।

অনুশীলনী

১। মধ্যযুগের শেষের দিকে সাহিত্য, শিল্প ও চিন্তাজগতে কি কি পরিবর্তন দেখা দেয়?

২। কনস্ট্যাণ্টিনোপলের পতন ইয়োরোপের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে?